বনে-পাহাড়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনে-পাহাড়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—দু'টাকা চার আনা—

এই লেখকের—

অপরাজিত
পথের পাঁচালী
আরণ্যক
অনুবর্ত্তন
দৃষ্টিপ্রদীপ
নবাগত
তৃণাঙ্কুর
দেবযান
ঊর্ম্মিমুখর
অভিযাত্রিক
মৌরীফুল
যাত্রাবদল
ক্ষণভঙ্গুর
কেদার রাজা
মেঘমল্লার
কিন্নরদল
আদর্শ হিন্দু হোটেল
বিপিনের সংসার
জন্ম ও মৃত্যু
বেণীগির ফুলবাড়ী
স্মৃতির রেখা
দুই বাড়ী
হীরামাণিক জ্বলে
চাঁদের পাহাড়
বিচিত্র জগৎ
মরণের ডঙ্কা বাজে
উপল খণ্ড
ইছামতী

মিত্রালয় : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪ টেম্পল প্রেস হইতে মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বনে-পাহাড়ে

সিংভূম-জেলার বন-জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণী ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব্ব। বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে যাবার কোনো সহজ উপায় ছিল না, কেউ যেতোও না সে সময় —যা একটু আধটু যেতো—এবং যে ভাবে যেতো—তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়ে। সিংভুম-জেলার ভেতরকার পাহাড় জঙ্গলের কথা ছেড়ে দিই—বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অনেকস্থান জনহীন অরণ্যসঙ্কুল থাকার দরুণ 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বনময় দেশ বলে অভিহিত হোত। এ সব লোক প্রাণ হাতে করে যেতো ঐ সব বনের দেশে। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না—যেতেই হোত।

ওই দেশের মধ্যে দিয়ে ছিল পুরী যাওয়ার রাস্তা। মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যে দিয়ে এই পুরোনো পথ এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এই পথে একদিন পুরী গিয়েছিলেন। কত লোক যেতো সেকালে। সাধু ঈশ্বরপুরী একা এই পথে পুরী রওনা হন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে এই পথ আজও আছে, আজকাল জেলা-বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ী থেকে পাঁচ মাইল কিংবা তার কিছু বেশি গেলেই বম্বে-রোডের সঙ্গে এই রাস্তা মিশে গিয়েছে এবং সোজা তারপর চলেছে উড়িষ্যার দিকে, ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাকে কেন যে 'বম্বে-রোড' বলা হয় তা জানি নে—কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক

চর্ম্মচক্ষে আবিষ্কার করা যায় না। তবে যদি কেউ বলে, এ রাস্তা দিয়ে কি মশাই তবে বম্বে যাওয়া যায় না? আমায় বলতে হবে—বিশেষ করে বম্বে যাবার জন্য এ রাস্তা নয়। ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে এ রাস্তা সোজা চলে গেল সমুদ্র তীরের দিকে। তবে এ রাস্তা থেকে অন্য একটা রাস্তা বেরিয়েছে ময়ূরভঞ্জের বাঙ্গিপোস নামক জায়গায়। সে রাস্তায় বেঁকে গেলে কি হয় বলা যায় না—হয়তো বম্বে যেতে পারে। সে রকম দেখতে গেলে তো যে কোনো রাস্তা দিয়েই বম্বে যাওয়া যায়। যে কোনো জেলার যে কোনো রাস্তাকে তবে বম্বে-রোড কেন বলা হবে না?

চিরকাল পথে পথে বেড়িয়ে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে খারাপ। পথ যেন ডাকে, হাতছানি দেয়।

সেদিন ছিল অষ্টমী তিথি।

সন্ধ্যার পরেই কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। ঝাড়গ্রামে আমার এক আত্মীয়-বাড়ীতে গিয়ে দিন দুই আছি—হঠাৎ ইচ্ছে হোল এমন জ্যোৎস্নায় একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

জায়গাটা রাজবাড়ীর পাশে—পুরোনো ঝাড়গ্রাম। ষ্টেশনের কাছে হয়েছে নতুন কলোনি, কলকাতার অনেক ভদ্রলোক বাড়ী করেছেন সেখানে, কিন্তু পুরোনো ঝাড়গ্রামের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। এখানে পুরোনো দিনের রাজাদের গড়খাই ও দুর্গ প্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়, আর আছে শালবন, আগাছার জঙ্গল, পুরোনো দেউল, দীঘি। দিব্যি রোম্যান্টিক পরিবেশ। পুরোনো দীঘির ধারে হাট বসে, তার আগে সাবিত্রী-মন্দির।

সাবিত্রী-মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল গ্রামের বাইরে

মাঠ ও বনের দিকে। একাই চলেছি, শালবনে কচি পাতা গজিয়েছে, কুসুম-গাছের রঙিন কচি পাতার সম্ভার দূর থেকে ফুল বলে ভুল হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথ শালবনের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়েছে—সুঁড়ি পথের দু'ধারে শালবন।

একাই চলেছি। এ পথে কখনো আসিনি, কোথায় কি আছে জানিনে। ভালুক বেরুবে না তো? শুকনো শালপাতার ওপরে খস্‌খস্ শব্দ হোলেই ভাবছি এইবার বোধ হয় ভালুকের দর্শনলাভ ঘটলো। আরও এগিয়ে চলেছি—একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে চলেছে পথের ওপর দিয়ে। হাঁটুখানেক জল, এমনি পার হয়ে ওপারের পাড়ে উঠলাম—উঁচু কাঁকর মাটির পাড়।

সহর থেকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেছি। জ্যোৎস্নাস্নাত উদার বন-প্রান্তর আমার সামনে। ফিরবার ইচ্ছা নেই। আরও খানিক গিয়ে শালবন পাতলা হয়ে এল—মাঠের মধ্যে দূরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে গেলাম। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, ফাঁকা মাঠের মধ্যে—একটু দূরে একটা গ্রাম আছে বলে মনে হোল। ঘরখানার চারিদিকে বাঁশকঞ্চির বেড়া, আমার স্বর শুনে গেরুয়া পরা একটি সন্ন্যাসী ঘর থেকে বার হয়ে এসে বল্লেন—কোথা থেকে আসছেন? আমি বল্লাম, ঝাড়গ্রাম থেকে। এটা কি আপনার আশ্রম?

—হ্যাঁ, আসুন, বসুন।

সন্ন্যাসী একখানা দড়ির খাটিয়া ঘরের সামনে মাঠে জ্যোৎস্নায় পেতে দিলেন। বেশ চমৎকার লাগছিল আমার, একদিকে অস্পষ্ট বনরেখা, অন্য দিকে ধূ ধূ করছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর। সহরের পথ চিনে ফিরতে পারবো কি না এই রাত্রে, তাই বা কে জানে?

পায়ে-চলা সরু আঁকা বাঁকা মাটির পথের সন্ধান যদি নাই মেলে ফিরবার মুখে ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—রাতে বেরিয়েছেন একা ?

—কেন, কোনো ভয় ভীত আছে নাকি ?

—নাঃ, কিসের ভয়। তবে ভালুক টালুক দু একটা—

—ওর জন্যে ভাবনা নেই। হাট থেকে হরদম লোক যাতায়াত করছে এপথে—মানুষের সাড়া পেলে ভালুক থাকে না।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি, ওর জীবনের কাহিনী সব জেনে নিই, কোথায় বাড়ী কোথায় দেশ, এসব শুনি। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আশ্রমের বেড়ার গায়েই মাটিতে পড়ে আছে—অথচ তাতে অনেক ফুলও ধরেছে।

বল্লাম—গত আশ্বিনের ঝড়েই বুঝি গাছটা পড়েছে ?

—হ্যাঁ, এদিকে ততটা হয় নি, তবুও দু' দশটা গাছ পড়েছে বৈকি।

—মেদিনীপুরের ওই দিকটার সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেল, অথচ পশ্চিম মেদিনীপুরে বিশেষ কিছু হয়নি দেখছি। এই গ্রামের নামটা কি ?

—খানাকুই।

—কত দিনের আশ্রম আপনার ? আছেন কতদিন এখানে ?

—তা প্রায় আট-ন' বছর। শিষ্য আছে জন দুই কলকাতায়—তারাই এ আশ্রমের ঘর তৈরি করে দিয়েছে—মাসিক কিছু সাহায্যও করে।

—এ বনের মধ্যে ভাল লাগে ?

—আছি বেশ। গ্রামের লোকের বড় জলকষ্ট। শিষ্যদের

বলে আশ্রমে একটা পাতকুয়ো করে দিয়েছি, গ্রামের সবাই জল নিয়ে যায়। তবে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট, কিছু মেলে না এ সব গাঁয়ে। কপি আর টোমাটোর ক্ষেত করেছি ঐ দেখুন। ঐ ভরসা। তাও গরমকালে জলাভাবে সব শুকিয়ে যায়। দারুণ জলাভাব।

বসে গল্প করছি, গেরুয়া কাপড় পরা একজন সন্ন্যাসিনী এসে এক পেয়ালা চা দিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বল্লেন, মা ঠাকরুণ। বল্লাম—ও, আপনার মা ?

—না, আমার শিষ্যা। ওঁরও কেউ নেই। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ী। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। আমি কাছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি আজ পাঁচবছর। আমার রান্না করে দেন। আশ্রমের কাজকর্ম্ম করেন।

—কেউ নেই ?

প্রশ্নটা যেন আপন মনেই জিগ্যেস্ করি। সংসারে যার কেউ নেই, এই ভাবেই কোথাও না কোথাও তার আশ্রয় জুটে যায় বৈ-কি। ভগবানই জুটিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী বলছিলেন—আমার পাশে জমি কিনে রেখেছে কলকাতার একজন নার্স। তারও কেউ নেই। সে আমার শিষ্যাও নয়। অথচ এই আশ্রম দেখে আর মা ঠাকরুণকে দেখে বলেছে, এইখানেই আমার থাকা সুবিধে হবে। এইবার বোমার হাঙ্গামার সময়ে এসে আমার এখানে কিছুদিন ছিল।

—জমি পাওয়া যায় ?

—কেন যাবে না, নেবেন ?

আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভাল জায়গা দেখবো, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ী তৈরি করি। সুতরাং অন্যমনস্ক-ভাবে বলেই ফেললাম—ইচ্ছে তো আছে।

—হাঁ, হাঁ, আসুন না ? জমি আমিই দিচ্ছি। ঘরদোর আপাততঃ আমার আশ্রমের মত খড়েরই করুন, সস্তায় হবে।

—বেশ, তবে ঘর তৈরির দেখাশুনো আপনাকে করতে হবে। আমি তো কালই চলে যাচ্ছি, টাকা পাঠিয়ে দেবো।

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তরের মধ্যে বসে আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সেখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছি মনে হোল। কি সুন্দর হবে যখন এখানে নিজের ঘরের সামনে বসে থাকবো এমনি নির্জ্জন রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে।

একটু পরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে সেখানে আর যাওয়া ঘটে নি—যেমন ঘটেনি আরও কত ওর চেয়েও ভাল জায়গায় যাওয়া—যেখানে যেখানে বাড়ী করবার অদম্য ইচ্ছা একদিন মনে হঠাৎ জেগেছিল এবং হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মধ্যে আমার ঝাড়গ্রামের সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন—তুমি কি কোনো সাধুকে জমি কেনার কথা বলেছিলে ? একদিন হাটে আমার সঙ্গে এক সাধুর দেখা। আমায় বল্লেন, আপনাদের বাড়ীতে এসেছিলেন কলকাতার একটি বাবু, তিনি জমি নেবেন বলেছিলেন। জমি সব ঠিক করে ফেলেছি, তিনি যদি আসেন তবে জমিটা লেখাপড়া করিয়ে দিই। ভাবে বুঝলাম, তুমি।

মনে পড়লো আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেবো বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য্য দেখে ভুলে যাই যে অত জায়গায় বাড়ী করবার মত পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জ্জিলিঙ গিয়ে ভাবলাম 'ঘুমে' একটা বাড়ী না করলে আর জীবনে ঘুম নেই ! কিন্তু

যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্ততঃ ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম সহরে বাড়ী হবার যো নেই—তখনই—শত হস্তেন বাজিনাম্।

ঝাড়গ্রামের আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ব্লাক-আউটের কলকাতায় বসে ক্ষণকালের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো খানাকুই গ্রামের প্রান্তে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তর, বনে, ঝোপে অজস্র ফোটা ল্যান্টানা ফুল, নানা রং-বেরংএর। এই ফুলটা ওখানকার জঙ্গলে যত দেখেছি এত বাংলাদেশের এ অঞ্চলে কোথাও দেখিনি। তবে আজ কাল কিছু কিছু আমদানি হয়েছে, বিশেষতঃ রেললাইনের ঢালুতে। রেললাইনের ঢালুতে অনেক বিদেশী ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো রেলগাড়ীর সাহায্যে ঐ সব বীজ দেশবিদেশে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আমি জানিনে।

জানুয়ারী মাস। আমি ঘাটশিলা আছি সে সময়। পাশের ষ্টেশন হোল গালুডি। কয়েকটি বন্ধু সেখানে ইংরিজি নববর্ষের উৎসব করবেন, আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন।

হেঁটেই রওনা হই। বেশি নয় ছ মাইল রাস্তা। কিন্তু পথের দৃশ্য আমার কাছে বেশ ভালই লাগে। উঁচু রেলপথের বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ডাইনে মাইল দুই আড়াই দূরে এবং বাঁয়ে মাইল চারেক দূরে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল শৈলমালা চলেছে বরাবর। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলমালা, বাঁদিকে কালাঝোড়।

বেলা পড়ে এসেছে। একস্থানে রেলওয়ে কাটিং, অর্থাৎ সেখানে উঁচু ডাঙার কঠিন পাথরের মধ্যে দিয়ে রেললাইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড় বড় চূণাপাথর ও বালিপাথরের চাঁই পড়ে আছে, খুব উঁচু পাথরের স্তূপ দেখাচ্ছে অনুচ্চ পাহাড়ের মত।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাতে একটু বসে নিলাম। সূর্য্য হেলে পড়েছে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশের মাথায়। কিছুদূরে জগন্নাথপুর বলে সাঁওতালী গ্রাম। একটা মাদার গাছ। ধূ ধূ করছে সিংভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর। শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে বলে আলোয়ানটা মুড়িসুড়ি দিয়েছি।

হঠাৎ একটা লোক বাংলা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে—"হরি দুখ দাও যে জনারে।"

বাংলাদেশ থেকে দূরে নীলকণ্ঠের গান কে গাইতে গাইতে যায়? ছেলেবেলায় বাবার মুখে শোনা গান—এখন এসব গানের চলন আর কোথাও নেই। সিনেমার গানে দেশ গিয়েছে ভরে!

আমার ডাকে লোকটা কাছে এল। মলিন তালি দেওয়া নীল প্যাণ্ট ও সার্ট পরা একজন সাঁওতাল যুবক। বল্লাম—বাড়ী কোথায় রে?

বনকাটি।

মৌ-ভাণ্ডাতে কাজ করিস্?

হাঁ বাবু।

এ গান শিখলি কোথায়?

বুড়া লোকদের মুখে শেখা বাবু।

সবটা জানিস্ গা' দিকি—

বাবু, তোমাদের সামনে কি আমরা গান গাইতে পারি? উশ্চারণ হয় না—

ঠিক হবে, তুই গা। কি কাজ করিস্?

স্মিলোটে (অর্থাৎ স্মেলটিং বিভাগে)—

হপ্তা কত পাস্?

চার টাকা সাত আনা বাবু—

আচ্ছা গান গা—

গান গেয়ে ছোকরা চলে গেল। আমিও উঠে কাঁদোড় নামে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝর্ণা পার হয়ে গালুডি এসে পৌঁছলুম। বড় বড় পাহাড়ে তখন ছায়া পড়ে এসেছে—দূর থেকে বেশ দেখাচ্ছে পাহাড়ের গা'গুলো। কাঁছোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েরা মাছ ধরছে, কুলিরা মাঠ থেকে ঘুটিং পাথর কুড়ুচ্ছে গালুডির মাড়োয়ারী মহাজনদের জন্যে।

গালুডিতে পৌঁছুতে বন্ধুরা খুব খুসী হলেন। নববর্ষের উৎসবে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা অভিনয় করলে, যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া গেল। ঘাটশিলাতে ফিরলাম সেই রাত্রেই, জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মোটরে। বাড়ী আসতেই শুনলাম, চাঁইবাসা থেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল, সেখানে সভা করতে যেতে হবে। বল্লাম—তারা গেল কোথায়?

—তুমি গালুডি গিয়েছ শুনে, ওরা মোটর নিয়ে সেখানে গেল খুঁজতে।

—পথে তো কোনো মোটরের সঙ্গে দেখা হয় নি, তবে আমরা মোড় ঘুরলে হয়তো ওরা পৌঁছেচে, এ হতে পারে।

আমার ভাবনা হোল বিদেশী লোক রাত্রে থাকবে কোথায়? তাদের তো গালুডি যাবার কোনো দরকারই ছিল না। সে রাতে কেউ এল না, খুব সকালে দেখি একখানা মোটর বাড়ীর পাশে দাঁড়ালো। আমি এগিয়ে গেলুম, চাঁইবাসার তারাই বটে।

—কাল গালুডি গিয়েছিলেন কখন?

—আর মশাই কি কষ্ট। তখন রাত দশটা।

—তারপর?

—খুঁজে তো বাড়ী বের করলাম, তাঁরা বল্লেন, এইমাত্র মোটরে ওঁরা চলে গিয়েছেন।

—রইলেন কোথায় ?

—সেখানকার ডাকবাংলোয়।

যাহোক, খেয়ে-দেয়ে চাঁইবাসা রওনা হই। সুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারা কংক্রিটের নীচু সাঁকোর উপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইছে—আমরা মোটরে সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—কিন্তু বর্ষাকালে সাঁকো ডুবে যায়, ডোঙা ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

মুসাবনীর রাস্তা আরও দু মাইল দূরে। চওড়া মোটর-রোড, একদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলশ্রেণী, অন্যদিকে বন। টাটা-কোম্পানী এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে schist পাথর কেটে নিয়ে যাচ্ছে ; সেখানটাতে পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন একটা দগদগে ঘা।

রাখা-মাইন্‌স্‌ পার হয়ে বন পাতলা হয়ে এল। চষা ক্ষেত, সাঁওতালী গ্রাম ডাইনে। বাঁদিকে কিন্তু সেই যে পাহাড় চলেছে, তো চলেছেই। শীতকালে পত্রবিরল দীর্ঘ দীর্ঘ শালের গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন পাহাড়ের ওপরে শালের খুঁটি পুঁতে রেখেছে।

বাঁদিকে এক জায়গায় একটা নাবাল মত উপত্যকা। সঙ্কীর্ণ গিরিপথের বাঁ দিকের পাথরে সিঁদুরের দাগ লেপা। এখানকার নাম কাপড়গাদি ঘাট। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এই পর্য্যন্ত এসে আর নাকি এগোন নি (পাণ্ডবেরা যাননি দুনিয়ায় হেন জায়গা দেখিনি ! পাণ্ডবদের পদচিহ্ন সর্ব্বত্র), অতএব এরও আগের ভূভাগ হোল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। আর এখানে কবে তাঁরা নাকি ময়লা কাপড় সাবান সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই এর নাম

কাপড়গাদি ঘাট। বেচারী পাণ্ডবেরা! বনে জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে বেড়ালে কাঁহাতক কাপড় পরিষ্কার রাখা যায়? আরও এগিয়ে গেলুম মাইল বারো—সবসুদ্ধ যেতে হবে ৪৭ মাইল রাস্তা এই রকম শোভাময় বনপথ দিয়ে।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়ে একটা রেললাইন আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় যেন গেল। শুনলাম, এটা টাটা-বাদামপাহাড় লাইন। এর পরেই দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে তিরিন্ বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাড়ীঘরগুলো বিশালপ্রান্তরে দিক্‌হারা হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন পরস্পরে জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

এক পাশে একটা ডাকবাংলো মত ঘর। সেখানে গিয়ে মোটর থামাতেই একটি বাঙালী বাবু এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আপনাকে একবার নামতে হচ্ছে।

—কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে, চাঁইবাসা পৌঁছুতে।

—তা হোক্, সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা—

কি করি, নামতেই হোল! মাঝারি আকারের বাংলো, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা। ভদ্রলোকটির বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়, এখানে পি. ডব্লিউ. ডি'তে চাকুরী করেন।

—কতদিন আছেন?

—তা প্রায় দু বছর—

—কেমন লাগে?

—আমি এক রকম যা হয় থাকি, কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদেয় বড় কষ্ট।

—এ গ্রামে—

—এ গ্রামের কথা বাদ দিন। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না—বাঙালীর মেয়ে অন্য বাঙালী মেয়ের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে, তাদের হয়েছে সত্যিকারের বনবাস।

—কিন্তু সিনারি বেশ, কি বলেন?

—সে আপনাদের চোখে হয়তো লাগতে পারে। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে—

মেয়েদের হাতে যত্নে সাজানো রেকাবে জলখাবার ও চা এল। আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবুটির কথা শুনে গৃহলক্ষ্মীদের জন্যে সত্যিই মনে কষ্ট অনুভব করছিলুম, এ যেন সেই আরিদোনার মরুভূমির মত রুক্ষদর্শন ভূভাগ—কালো কালো অনাবৃত পাহাড়। টিলা উন্মুক্ত দিকচক্রবাল, এখানে মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠবার কথা বটে।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আতিথেয়তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠলুম। আরও মাইল দশ বারো গিয়ে খড়কাই নদী। নদী পার হয়ে মোটর থামিয়ে সেই নির্জ্জন বালুকাস্তৃত নদীচরে অস্পষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। দূরে একটা পাহাড়, সামনে কটা রংএর বালুরাশির মধ্যে নাতিগভীর খাত সৃষ্টি করে ক্ষীণকায়া, খড়কাই বয়ে চলেছে। কেমন একটি উদাস শোভা এই জনহীন প্রান্তরের, এই পার্ব্বত্য তটিনীর, রহস্যময়ী সন্ধ্যার।

চাঁইবাসা পৌঁছে গেলাম রাত আটটার মধ্যে।

সভার কাজকর্ম্ম পরদিন মিটে গেল। ওখানকার বন্ধুরা তখনও ছাড়তে চান না। দুজন ফরেষ্ট-অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়ে গেল। তাঁরা বল্লেন—আপনি বনের কথা লিখেছেন অনেক, কিন্তু সিংভূমের বন আপনি দেখেন নি—

আমি বল্লাম—কেন, অনেক বন তো দেখা গেল—

তাঁরা মৃদু মৃদু হাসলেন। বল্লেন—আমরা ফরেষ্ট-অফিসার হয়ে বন দেখিনি, আর আপনি বন দেখেছেন ? হোতেই পারে না।

—কোন্ বনের কথা বলচেন ?

—আপনি বাঝিয়াচুর দেখেন নি, চিটিমিটি দেখেন নি, জাতে দেখেন নি।

—জাতে ? সে আবার কি রকম নাম ? চিটিমিটিই বা কি নাম—

—হো-ভাষার নাম। ও অঞ্চলের বনে বাসিন্দা সবই হো—যেমন রাঁচীর ওদিকে সব মুণ্ডা। চলুন আপনাকে ওদিকটা দেখিয়ে আনি—

আমার আসল বন ভ্রমণ এইভাবে স্থুরু।

৩রা জানুয়ারী। বন্ধুরা মোটর নিয়ে এলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হোল। রোরো নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ী সোজা চললো রাঁচী-রোড বেয়ে প্রায় মাইল দশেক। তারপরেই বাঁদিকের ফরেষ্ট-রোড ধরে বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললো।

চাঁইবাসা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের বড় শোভা। রাঙামাটি, উচ্চাবচ ভূমিভাগ, ছবির মত দেখতে সমস্তটা। মুস্কিল হয়েছে, যারা সেখানে অনেকদিন আছে, তারা সেখানকার সৌন্দর্য্য ভালো ধরতে পারে না। চাঁইবাসার বাসিন্দাদের অনেকের মতে এসব এমন আর কি ?

এখানে একটা কথা মনে পড়লো। ঘাটশিলা থেকে সাত আট মাইল দূরে বেশ একটি নির্জ্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র একটি ঝর্ণা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎকালে, পর্ব্বতসানুর বনে

অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে ঝরেছে শিলাতল বিছিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড়ঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন—এ কি আর এমন। কাশ্মীরে যা দেখেছি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করছি নে। কাশ্মীর ভাল নয় কেউ বলছে না—তা বলে, যে একবার কাশ্মীর দেখেছে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য্য দেখবার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে ? এ যদি হয় তবে কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক !

বরকেলা শৈলশ্রেণীর মধ্যে বনপথে অনেকখানি গিয়ে সেদবা নামে একটি বন্যগ্রাম আছে। সেখানে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্য একটি বাংলো আছে। বেলা প্রায় বারোটা। রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে হবে এখান থেকে। আমরা চা খেয়ে বাংলোর আরাম-কেদারায় গল্প করি কিছুক্ষণ।

মিঃ সিংহ বলেন—আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন বলে ভাববেন না এ বড় আরামের জায়গা।

—কেন ?

—রাত্রে এই বাংলোর বারান্দাতেই আমি বাঘ বেড়াতে দেখেছি।

—গ্রাম তো রয়েচে নিকটে।

—গ্রাম থেকে ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় বাঘে।

—মানুষও নাকি ?

—সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

ঘরের বাইরে এসে চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিলাম। বাংলোর পিছনে বোধহয় একশো হাতের মধ্যে উঁচু পাহাড়। ঠিক এ রকমই পাহাড় ও বাংলোর সম্মেলন এইবার আর একজায়গায় দেখেছিলুম সে কথা পরে বলব। সেটা হল মানভূম জেলায়। পাহাড়ের ঢালু থেকে বনানী নেমে এসে বাংলোর হাতায় মিশেছে, লোকজন তত চোখে পড়ে না।

একটা ছোট খড়ের ঘরের সামনে এসে মোটর দাঁড়ালো। বস্তি নয়, অন্ততঃ আশে পাশে লোকজনের বাস দেখলাম না। শুনলাম ঘরটা গবর্ণমেণ্টের বাংলো, বনবিভাগের লোকজন সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারে।

এখান থেকে বামিয়াবুরু প্রায় ১১ মাইল দূরে। এই এগারো মাইলের মধ্যে লোকজনের বাস নেই—ঘন বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে পড়লো ক্রমশঃ—মোটর রোড ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠলো—বড় বড় গাছ দুধারে, প্রায়ই শাল আর মহুয়া।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা—চেয়ে দেখি আকাশ যেন অনেকখানি নীচে, বুঝলাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েচি।

মিঃ সিংহ বললেন—মুখ বার করে চেয়ে দেখুন, ওই ওপরে ফরেষ্ট-বাংলো।

সত্যই অনেক উঁচুতে বাংলোটা। যে পাহাড়ে উঠচি, এই পাহাড়ের মাথায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটা বাংলোঘরের লাল টালির ছাদ একটু একটু চোখে পড়চে।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মোড় ঘুরে মোটরটা অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে একটা প্রকাণ্ড বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল, তখন শীতের

সন্ধ্যার রাঙা রোদ নিকটে দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েচে।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বনাবৃত পর্ব্বতশিখর, ছোট বড়—নানা আকারের পর্ব্বতচূড়া, কোনোটা গোল, কোনোটা মোচাকৃতি, কোনোটা সমতল, ঘন বনে ভরা, আবার কোনো কোনো পর্ব্বত গাত্র অনাবৃত, কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তর সাজানো, রাঙা রোদ পড়ে সোনার পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে।

বল্লুম—নিকটে কোনো লোকালয় নেই?

—নিকটতম লোকালয় সেই কুইরা গ্রাম। এগারো মাইল দূর এখান থেকে—

—বড্ড নির্জ্জন জায়গা। এখানে কি কেউ থাকে?

—বাংলোর চৌকীদার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে পাহাড়ের নীচের দিকে?

অদ্ভুত বনের দৃশ্য বটে। বাঘ ভালুক আছে?

—বুনো হাতী যথেষ্ট। বাঘও আছে, ভালুকও আছে—

চায়ের টেবিল পাতা হোল—আমি প্রস্তাব করলাম, টেবিল টেনে বাংলোর সামনে সমতল জায়গায় পাতা হোক্। রাঙা রোদ মাখানো অরণ্য ও পর্ব্বতশিখরের দিকে চোখ রেখে বসে চা খাওয়া যাক। সত্যিই এমন গম্ভীর অরণ্য-দৃশ্যের মধ্যে চা খাওয়া হয়নি কতকাল। এই বাংলোর সামনে দিয়ে গভীর রাত্রে কত বন্য হাতী, বাঘ, ভালুক চলে বেড়ায়—গবর্ণমেণ্টের নোটিস টাঙানো আছে বেশি রাত্রে বাংলোর বারান্দায় কেউ না আসে—এমন নির্জ্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে রুটি, মাখন, চা প্রভৃতি সভ্য খাদ্য খাওয়ার নূতনত্ব আছে বই কি।

চা খাওয়ার পরে মিঃ সিংহ বল্লেন—অন্ধকার হওয়ার দেরি আছে এখনও। চলুন আপনাকে মাছ ধরার বাঁধ দেখাই—

আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলুম, চারিধারে নির্জ্জন ঘন অরণ্যানীর স্তব্ধতা ; কয়েকটি হো-কুলি-মেয়ে পাতালতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের সামনে বসে বুনো খেজুর পাতার চেটাই বুনচে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের কি হাসি। আমি হো-ভাষা জানি না, মিঃ সিংহ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্ত্তা বল্লেন।

আমি বল্লুম—কি বলছে ওরা ?

—বলচে, বাবু এখানে কি দেখতে এসেচ !

—জিজ্ঞেস করুন ওদের নাম কি।

—একজনের নাম সামান্ কুই একজনের নাম বুধুন্ কুই—কুই অর্থাৎ মেয়ে।

—বেশ নাম। ওরা কি খাবে ?

—শুধু ভাত। না ডাল, না তরকারী, ও সব খেতে জানে না এদেশে।

—সারাদিনে কি রোজগার করে ?

—চার আনা।

এতেই সন্তুষ্ট থাকে ?

—খুব। একটু পরে দেখবেন গান করবে সবাই এক সঙ্গে। ওদের মত অল্পে সন্তুষ্ট জাত নেই। মিথ্যা কথা বলতে জানে না, অত্যন্ত সরল। সভ্যতার সম্পর্কে যারা এসেছে, তারা সবাই দুষ্টু, বদমাইস্ হয়ে গিয়েচে। কোন টাউন বা কারখানার নিকটে যে সব হো বা ওঁরাও বাস করে, প্রায়ই সব খারাপ। কিন্তু এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সে কথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মত পবিত্র, সরল, নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভতা ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখা রয়েচে।

মিঃ সিংহ বল্লেন—আর একটা মজা, এরা বেশি রোজগার করতে চায় না। দিনের সামান্য মজুরি হাতে পেলেই খুসী। আর কিছুতেই কোনো প্রলোভনেই সেদিন খাটতে চাইবে না। এক জায়গায় সবাই গোল হয়ে বসে চেটাই বুনবে, গান গাইবে। কিন্তু রাঁচী সহরে গিয়ে এদের দেখুন, অন্যরকম দেখবেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ঝর্ণার কাছে এলাম। ঝর্ণার এক দিকে বাঁধ বাঁধা। বর্ষাকালে এখানে একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়। মিঃ সিংহের মুখে শুনলাম, এটাই মাছ ধরার বাঁধ। কোথা থেকে মাছ আসে একথা আমি জিজ্ঞেস করিনি।

তখন সে সব তুচ্ছ প্রশ্নের অবকাশও ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে অরণ্যের অলি-গলিতে, সুঁড়ি পথে ঘন হয়ে নামচে। যেখানটাতে মাছের বাঁধ তার চারিধারে বড় বড় শালগাছ উঁচু হয়ে আকাশকে ঢেকেচে—শুধু অন্ধকার আর, জলপতনধ্বনি আর নির্জ্জনতা আর মনের মধ্যে এক রকমের গা ছম্ ছম্ করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি। মাছের বাঁধ ছেড়ে আরও প্রায় দু'রসি গিয়েচি তখন। দু'রসি কি তিন রসি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে আমার মনে হোল এ পৃথিবীতে আমি আর এই দুই বন-বিভাগের কর্ম্মচারী ছাড়া (দুজনেই মিঃ সিংহ—হরদয়াল সিংহ ও যোগীন্দ্র সিংহ) আর বুঝি কেউ নেই—আফ্রিকার ঘন অরণ্যে নর-খাদক অসভ্য জাতিদের দেশে যেন এসে আটক পড়ে গিয়েচি। যেমন ঘন বনানী তেমনি ঘন অন্ধকার চারিপাশে।

হরদয়াল সিংহ হঠাৎ বল্লেন—এইখানটা একটু সাবধান, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার ওই সুঁড়ি পথটা দিয়ে জল খেতে নামে ঝর্ণায়।

জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটুখানি সরু পথরেখা অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেচে মনে হোল। বল্লুম—তা গিয়ে—এবার ফিরলে ভাল হোত না? বাংলো থেকে প্রায় মাইল দেড়েক তো এসে গিয়েচি।

ফিরবার পথে আবার সেই হো-মেয়েদের আস্তানা। বাঘের, হাতীর, বুনো ভালুকের দেশের মেয়ে এরা। দিব্যি সেই অরণ্য মধ্যে দরজাহীন, অর্গলহীন পাতার কুঁড়ের মধ্যে বসে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করচে। কেউ কেউ কুঁড়ের সামনে বসে চেটাই বুনচে, গল্প করচে, গান করচে।

আমাদের দেখে আবার ওরা হাসতে লাগলো—অথচ হাসবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেমানুষের মত সম্পূর্ণ অকারণে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ।

আমাদের আপ্যায়ন করে বল্লে—জোম্ পে—জোম্ পে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কি বলে?

—বলচে, ভাত তৈরি—খাও।

—চলুন দেখা যাক—কি খাচ্চে।

বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হয়েচে, অথচ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। ওরা বড় কাঁসার উঁচু থালাতে এক রাশ ভাত ঢেলেছে এক একজনের জন্য। শুধুই ভাত—নুনই বা কৈ! আশ্চর্য্য এই যে, ওই নিটোল স্বাস্থ্য শুধু এই উপাদানবিহীন ভাত খেয়ে। আমি মিঃ সিংহকে বল্লুম—ওদের জিজ্ঞেস করুন ওরা ডাল তরকারী

খায় না কেন ? আমার প্রশ্নের অর্থ যখন তাদের বোধগম্য হোল, তখন তারা আর এক প্রস্থ হেসে উঠলো—যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি—উত্তর দিলে—এই খাই।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, কথার বাহুল্য নেই। শুধু উত্তর দিলে—এই খাই।

অনেক ঘেঁটু গাছ বনের প্রান্তে, পাহাড়ী ঢালুর সীমানায়। তবে কিনা এখন ফুল নেই গাছে, তবুও আনন্দ হোল গাছগুলো দেখে, এতদূর পাহাড়ী দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব বন্যপুষ্পের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটলো।

অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানটি, দূরে সৈদবা গ্রাম, কিন্তু বাংলো থেকে গ্রামের ঘরবাড়ী নজরে আসে না। আমরা কিছু দূরে একটি উপত্যকায় সাবাই ঘাসের চাষ দেখতে গেলুম, একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে, সে স্থানটি চারিদিকে বনে ঘেরা, মাঝখানে খানিকটা সমতল ফাঁকা মাঠ। গাঁট বাঁধা কলে হো-কুলিরা সাবাই ঘাসের আঁটি একত্র করে গাঁট বাঁধছে। নিকটেই গাছতলায় একজন কেরাণী বসে কুলিদের হিসেব রাখছে।

কেরাণী সর্ব্বত্রই বাঙালী। কাছে গিয়ে বল্লুম—মশাইকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনি এখানে ক্লার্ক ? কতদিন আছেন ?

—তা সাত বছর হোল।

—এ 'সাবাই' ঘাসের ব্যবসা কাদের ?

—আজ্ঞে দেবীপ্রসাদবাবুর, সন্তুয়া ষ্টেশনের কাছে আপিস আর আড়ৎ—মাড়োয়াড়ী।

—মাড়োয়াড়ী তো নিশ্চয়ই। সে আপনি বলবার আগেই বুঝেচি। জায়গা কেমন এটা ?

—ভালো। তবে বড্ড জঙ্গল—মানুষের মুখ দেখার জো নেই।

—থাকেন কোথায় ?

সৈদবা গ্রামেই বাবুদের বাসা আছে কর্ম্মচারীদের জন্যে, সেখানে রেঁধে খাই।

—ভাল লাগে ?

—নাঃ। তবে কি করি বলুন, চাকরীর খাতিরে সবই করতে হয়। এই বাজারে চাকরীটুকু গেলে—

—সে তো বটেই।

বনবিভাগের হু'জন বড় কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপরে যেখানে সাবাই ঘাসের চাষ চলচে পাহাড়ের ঢালু জমিতে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে পাহাড় ঘিরে। তার আশে পাশে গোছা গোছা উলু ঘাসের মত সবুজ সাবাই ঘাসের গোছা—আমন ধানের গোছার মত।

বল্লুম—ট্রেঞ্চ কিসের ?

হু'জন বনবিভাগীয় কর্ম্মচারীই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বল্লেন—জানেন না, জানেন না, ওর নাম কনটুর ট্রেঞ্চ—ওই খালমত কাটা আছে বলে পাহাড়ের মাটি সরস হয়ে উঠচে। ও জিনিসটা নতুন বেরিয়েচে, আগে ও থিওরিটা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, কনটুর ট্রেঞ্চের হাওয়া যতদূর যায়, ততদূর সরস হয়ে ওঠে মাটি আর বাতাস।

এঁকথা এদের মুখে আরও অনেকবার শুনেছি। কনটুর ট্রেঞ্চ থিওরির বড় ভক্ত এঁদের মত আর দেখিনি। সেই ভীষণ শুষ্ক

পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত যে কোনোদিন আবার এখানকার মাটি বাতাস সরস হবে।

বল্লুম—আপনারা ইজারা দেন দেবীপ্রসাদ মাড়োয়াড়ীকে ?

—ন' বছরের লিজ আছে ওর সঙ্গে। চার হাজার টাকা বছরে—

—তিনি কোথায় ঘাস বিক্রী করেন ?

—বামার লরি কোম্পানীর কনট্রাক্ট আছে—তারা সন্তুয়া ষ্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায়।

—বেশ লাভ আছে, কি বলুন ?

—খরচ-খরচা বাদে পাঁচ ছ' হাজার টাকা থাকে দেবীপ্রসাদবাবুর। নইলে কি কেউ ভূতের বেগার খাটে।

মনে ভাবলুম, ভূতের বেগার দেবীপ্রসাদবাবু খাটতে যাবেন কেন, সে যদি কাউকে খাটতে হয় তবে খাটচে, ওই বেচারী বাঙালী কেরাণী-বাবু। এই নির্ব্বান্ধব স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেটে হয়তো মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়—তাও পায় কিনা। ধনিক যিনি, তিনি প্রকাণ্ড অষ্টিন-গাড়ীতে চেপে এসে একবার এক ঘণ্টার জন্যে হয়তো এসে তদারক করেন।

সেই বনাবৃত উপত্যকার এক প্রান্তে সেই ঝর্ণাটির কুলুকুলু ধ্বনি বনপত্র-মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে এক মধুর সঙ্গীত রচনা করে চলেচে। আমরা তিনজনেই বটবৃক্ষের ছায়ায় শুকনো ছড়ানো সাবাই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আকাশ দেখি, বিহঙ্গ-কাকলী কান পেতে শুনি, খোসগল্প করি।

বেলা দুটোর পর বাংলোতে গিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। গরম গরম খিচুড়ি খেতে সেই বনের মধ্যে খুব মিষ্টি লাগলো।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথযাত্রা। দু'পাশের ঘন বন, একদিকের

পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটেচে। বন ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর হয়ে উঠেচে। যেতে যেতে এক জায়গায় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত কানে এল। ব্যাপার কি ? গান গায় কে ?

মিঃ সিংহ বল্লেন—দেখবেন ? এখানে কাইনাইটের খনি আছে—

—জঙ্গলের মধ্যে—

—বেশি দূর নয়, পথের ধারে।

মোটর থামিয়ে আমরা গাছপালা ঠেলে বনের মধ্যে ঢুকি। আমাদের সামনে একটা ধাওড়া চালাঘর, জংলীঘাসের ছাওয়া। ত্রিশ চল্লিশ জন তরুণী স্বাস্থ্যবতী হো-কুলিরমণী সেখানে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে লোহার দুরমুস্ দিয়ে পাথুরে কয়লার মত কি জিনিস চূর্ণ করচে আর এক সঙ্গে গান গাইচে হো-ভাষায়।

মিঃ সিংহ বল্লেন—ঐ কালো কয়লার মত জিনিসটাই কাইনাইট্।

—খনি কোথায় ?

—আরও জঙ্গলের মধ্যে।

—এর মালিক কে ?

—এও দেবীপ্রসাদ মাড়োয়াড়ীর। বনের মধ্যে খনির কাছেই এর বাসা আর আপিস আছে। সেখানে দু'তিন জন বাঙালীবাবু—

—খাতা লিখছে—

—হ্যাঁ।

আবার মোটরে এসে উঠলুম। বন ছাড়িয়ে উঁচুনীচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটোখাটো বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো হো-গ্রাম। ফিল্মের ছবির মত সুন্দর এই বন্য গ্রামগুলি। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট নীচু ঘরগুলি, চালায় চালায় বসতি, এরা ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বাড়ী তৈরি করতে জানে না ; এক

বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে অন্য গৃহস্থ চালা বসিয়েচে অন্যদিকে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে—বোধহয় সেগুলো পারিবারিক সমাধি বা দেবদেবীর স্থান। প্রত্যেক হো বন্য গ্রামেই এমন পাথর ছড়ানো দেখেছি—মোটা মোটা পাথর ডলমেন্ বা মেন্‌হিরের ধরণে খাড়া করে পোঁতা—তাদের গায়ে হিন্দিতে কি লেখাও আছে।

একখানা পাথরের গায়ে লেখা—বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাই।

ঘর—বনটুডি

জিলা—সিংভূম

জিজ্ঞেস করলুম—কাকে অমর করবার ব্যবস্থা এ?

মিঃ সিংহ বল্লেন—কেন বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাইকে?

—তার কি হয়েছে?

—সে মারা গিয়েচে।

আবার ফিরলাম বামিরাবুরু বাংলোতে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

পরদিন বামিরাবুরু বনের মধ্যে বেড়াতে বার হওয়া ঠিক হয়েচে, আমরা একটু বেশি রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম।

অন্ধকার রাত্রি; আমার চক্ষে ঘুম নেই, এমন বিশাল অরণ্যের মধ্যে কখনো রাত কাটাইনি। বসে বসে দেখছিলাম বাংলোকে ঘিরে চারিধারে শুধু বন আর পাহাড়, পনেরশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের এই বাংলো, সুতরাং এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্চে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর, আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা।

যোগীন্দ্র সিংহ বন বিভাগের কর্ম্মচারী বলেই যে বনশ্রী ভালবাসেন তা নয়—তেমন যোগাযোগটি সব সময় ঘটে না—ভাবুক লোক।

অন্ধকারময়ী রজনীর রূপ দেখবার জন্যে তিনিও আমার সঙ্গে জেগে বসে আছেন বাইরে।

কিসের একটা সুগন্ধ বাতাস। সিংহ বল্লেন—পাচ্ছেন গন্ধটা?

—ভারি চমৎকার গন্ধ বটে! কিসের?

—কোনো অজানা বনফুলের—

আমি একটা ভয়ানক ভুল অনেকক্ষণ থেকে করেছিলাম। বামিরা-বুরু এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যে একপ্রকার গাছকে আমি বরাবর কনক-চাঁপার গাছ বলে আসচি এবং এই দুই বন বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে তর্ক করেছি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায়—কারণ ওঁরা বলচেন, চাঁপাগাছ নয়। ও হোল ভেড্‌লেণ্ডিয়া—আর চম্পক হোল মাইকেলিয়া চম্পক; তার পাতা হবে কালো কালো লম্বা লম্বা। আমি বলে আসচি, না তা নয়। স্বর্ণচাঁপার পাতা অমন হবে না। এই যাকে বলচেন ভেড্‌লেণ্ডিয়া এই হোল স্বর্ণচাঁপা। ওঁরা আমার জেদ দেখে বলেছিলেন—তা হতে পারে হয়তো। কিন্তু ও গাছকে আমরা আগাছা স্বরূপ বিবেচনা করি।

এ ভুল আমার কি ভাবে ভেঙেছিল, সে পরে বলচি—এখন আমার হঠাৎ মনে হোল বনের সেই স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ নয় তো? কিন্তু এখন তো চাঁপাফুল ফুটবার সময়ও নয়।

বড় সুগন্ধ ফুলটার—যে অজানা ফুলই হোক বনের,—অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্ম-নিবেদন নিশ্চয় ব্যর্থ নয়। বিশ্বের বড় গেরস্থালিতে এতটুকু জিনিসের অপচয় হবার জো নেই।

অদ্ভুত গম্ভীর শোভা এই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যানীর। মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের

ছোট বড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে—মাঝে মাঝে দু একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক, সর্ব্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। শোওয়া কি যায়? এমন রাত্রি নিদ্রার জন্যে তৈরি হয়নি।

—আমরা জেগে বসে থাকি, কি বলেন মিঃ সিংহ?

—খুব ভালো।

মনে হোল এমন বিরাট অরণ্য কখনো দেখিনি জীবনে। এমন বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত-দর্শন শৈলশ্রেণী দুইয়ের এই যোগাযোগই এই অরণ্যকে সুন্দরতর, অধিকতর রহস্যময় করচে; এ দেখবার সুযোগ বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকে সহজেই যেতে পারেন বটে, যেমন মধুপুর, শিমুলতলা ইত্যাদি, কিন্তু সে সব স্থানে মানুষের ভিড়, ছোট বড় ঘরবাড়ীর ভিড়। দূরে বা নিকটে এমন ধরণের অরণ্য নেই।

দেওঘর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গল আছে বটে, কানিবেলের জঙ্গল; সেটা লছমীপুর গাড়োয়ালি ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। আমি একবার ভাগলপুর থেকে দেওঘর পর্য্যন্ত পদব্রজে আসি সেই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। সে বন বড় একটা মালভূমির ওপর, তার শেষ প্রান্ত থেকে দূরস্থিত ত্রিকূট পাহাড় নীলমেঘের মত দেখা যায়, কিন্তু সে এমন শৈলমালাবেষ্টিত নয়, এতবড় বনস্পতির সমাবেশও নেই সেখানে। ষ্টেটের লোক কাঠ বেচে জঙ্গল অনেক নষ্ট করে ফেলেচে। দেওঘর থেকে সেখানে যাবার এক হাঁটা পথ ছাড়া উপায় নেই; কাজেই ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার সুবিধা কোথায়?

হঠাৎ মিঃ সিংহ বল্লেন—ওই আলোটা দেখচেন আকাশে, কিসের বলুন তো?

একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার আকাশে কিসের আলো বটে। যেন দূরের কোনো অগ্নিস্রাবী আগ্নেয় পর্ব্বতের আভা আকাশপটে প্রতি-কল্লিত হয়েচে। আমি বুঝলাম না।

মিঃ সিংহ বল্লেন—ওটা টাটার আলো।

—এতদূর থেকে?

—খুব দূর কোথায় সোজা ধরলে ত্রিশ মাইল—

একটু পরেই আলোটা মিলিয়ে যেতে আমার আর কোনো অবিশ্বাস রইল না।

কিন্তু ঘন বনের দিকে কুকুর ডাকে কোথায়?

বল্লাম—কোনো বস্তি আছে নাকি ও পাহাড়ের মধ্যে?

মিঃ সিংহ বল্লেন—ও হোল একরকম হরিণের ডাক, বার্কিং-ডিয়ার, ঠিক কুকুরের মত ডাকে; যদি জেগে থাকেন, এ বনে আরও অনেক রকম জানোয়ারের আওয়াজ শুনতে পাবেন। হাতীর ডাক, বাঘের ডাক—

বেশি রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকা আমাদের অদৃষ্টে ছিল না। বাংলোর মধ্যে থেকে হরদয়াল সিং ডাকাডাকি করতে লাগলেন, এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকা ঠিক নয় এসব জায়গায়। বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে অসুখও তো হতে পারে।

পরদিন সকালে উঠে মিঃ সিংহ আমাকে এক অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখালেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে বালসূর্য্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। আগে সমস্ত বড় বড় শিখর গুলোতে কে যেন সিন্দূর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিলে। যে-দিকে চাই সেই অজানা আকাশপরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুলো, শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াসা দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল—কি সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাত।

আমরা চা পান করে বন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। চা খেতে একটু বেলা হোল ; এখানে জঙ্গলে কোথায় দুধ মিলবে ; দশমাইল দূরবর্ত্তী সেই কুইরী গ্রাম থেকে বনবিভাগের লোকে সাইকেল যোগে দুধ নিয়ে এল।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ—খানিকদূর নেমে এসে রাস্তায় উঠলাম আমরা চার-পাঁচজন লোক ; দু'জন বনবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী, দু'জন ফরেষ্ট গার্ড, আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে, আরও কয়েকটি লোক।

রাস্তার পাশের একটা সরু পায়ে চলার পথ নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকার, ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেচে। একটা সংকীর্ণ পাহাড়ী নালা বনের মধ্যে কুল্‌-কুল্‌ করে বয়ে চলেছে। এই নালার হো-নাম হচ্চে পোগা মারো গাঢ়া, বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হলো এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিনি, যা দেখছিলাম তা বাইরে থেকে। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ সোজা, খাড়া শাল, কেঁদ, বারম প্রভৃতি বনস্পতি শ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দিনের আলোক আটকেচে। সারদিনের মধ্যে এখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি ঈষৎ আর্দ্র, একটু বেশি শীতল, কাছে কাছে কত সুদর্শন অর্কিড, নিম্নে আগাছার জঙ্গলও বেশ ঘন।

এক জায়গায় ছোট-এলাচের গাছ হয়েচে, মিঃ সিংহ দেখালেন খুব বড় হলুদ গাছের মত পাতায় ছোট-এলাচের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে ক্ষীণ জলধারা আমাদের পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেচে, তার ওপর প্রস্তর-সঙ্কুল পথ, সুতরাং আমাদের যেতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে।

একটা মাঝারি গোছের গাছ দেখে ওঁরা বিজয়ের হাস্যে বলে উঠলেন—এই। এই হোল মাইকেলিয়া চম্পক, চম্পক ফুলের গাছ।

আমি বল্লাম—এ চম্পক গাছ হতে পারে, স্বর্ণচাঁপা নয়।

—আমরা অন্য চাঁপাগাছ চিনিনে—এগাছে চম্পক ফুল হয়।

—হতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর চাঁপা আপনারা যাকে ভেড্-লেণ্ডিয়া বলচেন ওই হোল স্বর্ণচাঁপা। এ গাছের পাতা আমাদের দেশের নোনাগাছের মত দেখতে—এ স্বর্ণচাঁপা গাছ নয় কখনো। তবে এ চম্পক ফুল আমি কখনো দেখিনি, সে আমি স্বীকার করচি।

বড় বড় গাছ বেয়ে এক ধরণের লতা উঠেচে। ওঁরা বলেন—বুনো মেটে আলু হয় এর তলায়। এদেশের হো-মেয়েরা বন থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

ঘন অরণ্যশীর্ষে প্রভাতের সূর্য্যালোক, ক্বচিৎ কোন বনপুষ্প সুবাস, এ বড় বনানীর একটা গভীর রহস্যের ভাব আমার মনে এনে দিয়েচে; ভুলতে পারচিনে অরণ্য সমাকুল সিংভূমের যে অংশে বিচরণ করচি, এটি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শ্বাপদ অধ্যুষিত এক মহাবন; ঠিক সৌখীন কোন পার্কে বেড়ানো নয় এটি—যে কোন সময়ে মত্ত হস্তীযূথ বা মহাকায় ব্যাঘ্রের সামনে এসে পড়তে পারি, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ফরেষ্ট গার্ডের স্কন্ধস্থ কুড়ল তখন কি কোনো কাজে আসবে?

হরদয়াল সিং বল্লেন—এখান থেকে টাইগার হিলে যাবেন।

—সে কোথায়?

—মাইল পাঁচেক দূরে এই বনের নিবিড়তম অংশে। বিহারের গবর্ণর একবার কনজারভেটরকে কি বলেছিলেন—তোমাদের বনের খুব wild জায়গাটি একবার দেখতে চাই। তাই বনবিভাগ থেকে এই স্থানটি নির্ব্বাচিত করা হয়। অবিশ্যি এর মধ্যে লাটসাহেবের সুখ সুবিধের দিকে কিছু দৃষ্টি রাখা হয়েছিল বই কি।

—কেমন জায়গাটি?

—খানিকটা পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। একটা পাহাড়ের ওপরে সমতলভূমি টেবিলের মত। সেখান থেকে চারিদিকে চাইলে মনে হবে পৃথিবীতে ঘন বন ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই। দৃশ্য বড় চমৎকার। সত্যিকার বনের সৌন্দর্য্য দেখবেন—

যাবার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঁচ মাইল কি যাওয়া যাবে হেঁটে সস্ত্রীক! উনি সঙ্গে না থাকলে কোন কথা ছিল না। দেখি কত দূর কি হয়।

যে নালার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে নালাটির কালো জলে বিশাল বনস্পতি শ্রেণীর ছায়া। এক জায়গায় খুব বড় কনটুর ট্রেঞ্চ, এখন জল নেই—বর্ষাকালে এর মধ্যে জল জমে বনভূমিকে আর্দ্র করে, মাটিকে সরস করে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

এইবার আমরা বনের উঁচুদিকে যাচ্ছি মনে হোল। কারণ লম্বা লম্বা ঘাস দেখা গেল এবার। ভূমি যেখানে অপেক্ষাকৃত নীরস ও পাষাণময়, সেখানে নাকি ঘাস দেখা যায় বনে। এ ধরণের ঘাস আর কোথাও জন্মায় না।

একজন ফরেষ্ট গার্ড কি ধরণের এক পাতা তুলে নিয়ে এল। শুনলাম, এ পাতা দিয়ে বনের লোকেরা দিব্যি চাটনি তৈরি করে খায়।

আমার স্ত্রী বল্লেন—কি করে চাটনি তৈরি হয়?

—শুধু বেটে একটু নুন দিয়ে খেলেই হোল। পুদিনার মত।

বেলা প্রায় দশটা। ঘড়ি দেখে সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এই বনের মধ্যে থেকে তা কিছুই বোঝবার জো নেই। রদ্দুর পড়ে নি মাটিতে বিশেষ কোথাও। ঘাস পাতা এখনও শিশিরার্দ্র।

আমি বল্লাম—আপনারা বাঘের ভয় করেন না?

মিঃ সিংহ বল্লেন—করলে আমাদের কাজ চলে না।

—বাঘের সামনে পড়েছেন কখনো ?

—দু-তিন বার। একবার মোটর ড্রাইভ করে ফিরছি পাটনা থেকে, গভীর রাত্রে কোডার্ম্মার জঙ্গলে প্রকাণ্ড রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার একেবারে গাড়ীর পাশে।

—পাশে ?

—হ্যাঁ, রাস্তার পাশে। একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ মেরে তাকে খাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন।

—কি আর করব। হেড্‌লাইটের আলো পড়তে আমি ওটাকে দেখতে পেলাম, তারপর ভয় হল গাড়ীর ওপর লাফিয়ে না পড়ে।

হরদয়াল সিং বল্লেন—আমি একবার বুনো হাতীর পাল্লায় পড়েছিলাম। একটা পাহাড়ের ঢালু দিয়ে সাইকেলে নামচি। একদল বুনো হাতী বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান নাড়ছে। বাঘের চেয়ে বুনো হাতী বেশি বিপজ্জনক—সোজা সাইকেল চালিয়ে দিলাম, পেছন দিকে আর চাইলাম না।

আমার স্ত্রী বল্লেন—এ বনে বাঘ আছে ?

—বড় বাঘ বিশেষ নেই। অন্য সব জানোয়ারই আছে। তবে বনকে বিশ্বাস নেই জানবেন।

পথের পাশে একটা বড় গাছের ছাল ওপর থেকে খুলে ঝুলে পড়েছে। সেটা দেখিয়ে হরদয়াল সিং বল্লেন—বলুন তো এ রকম কেন হয়েছে ?

প্রশ্নটা আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। তিনি কিছু বলতে পারলেন

না। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আগেই। বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে বনস্পতির এই দশা।

মিঃ সিংহ বল্লেন—টাটকা করেছে। এই দেখুন পায়ের দাগ। কাল রাতের ব্যাপার।

সত্যিই বটে। মাটির ওপরে হাতীর পায়ের দাগ এবং একটু দূরে হাতীর নাদ। বেশ বোঝা গেল সন্ধ্যার পরে এসব পথে যাতায়াত করা খুব সুবিধাজনক নয়।

এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে রাস্তার পাশে অনেক নীচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যে বনের মধ্যে আমরা বেড়াচ্ছি, সেটা যে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপরকার বন, নিম্নের উপত্যকা দেখে সেটা ভালোই বোঝা গেল।

হরদয়াল সিং বল্লেন—কেমন, যাবেন টাইগার হিলে ?

—আর কতদূর ?

—চার মাইল কিংবা সাড়ে তিন মাইল।

—ফিরতে তা হলে বেলা একটা বাজবে।

সেখান থেকেই বাংলোতে ফিরবার কথা হোল। আমার স্ত্রী আর যেতেই চাইলেন না।

এইবার যেখানে আমরা ধূমপান ও বিশ্রামের জন্যে বসলাম, সে স্থানটিকে বেমালুম আফ্রিকা বলে চালিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এদিকে গভীর পাহাড়ী খড, অনেক নিচে অগণ্য বনস্পতির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে, দুপুরের রোদ এসে পড়েছে তাদের ওপরে।

বনের প্রকৃতিও অন্য রকম।

হরদয়াল সিং বল্লেন—ঐ হোল আমাদের মিসেলেনিয়াস ফরেষ্ট। শাল ছাড়া আরও অনেক গাছ ওতে আছে।

—ওখানে নেমে চলুন দেখি না।

—পথের ধারে ওরকম একটা বিরাট area পড়বে অন্য জায়গায়। নীচে নেমে কষ্ট পেতে হবে না। ওখানে কিন্তু বিপদ আছে—

কেন ?

—সাপের ভয়। অনেক সময় বড় বড় বিষাক্ত সাপ থাকে। একটু সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।

বাংলোতে যখন পোঁছেচি, তখন বেলা একটার কম নয়। আমি স্নান করতে চাইলুম নীচেকার সেই ঝর্ণার জলে, কেমন চমৎকার কুলু-কুলুনাদিনী স্বচ্ছসলিলা ঝর্ণাটি, বনের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে আসচে—দুধারে কলের চিমনির মত কেঁদ আর শালের ভিড়! সেইখানেই স্নান করে আসি।

মিঃ সিংহ বল্লেন—না যাওয়াই ভালো। এসব ঝর্ণার জল অনেক সময় খারাপ থাকে।

হরদয়াল সিং বল্লেন, একবার লোহার ডানা না নেতার হাট এমনি কোনো একটা জায়গার কাছাকাছি বনে তিনি একটা ঝর্ণায় স্নান করেছিলেন বনের মধ্যে। তারপর সব শরীরে চাকা চাকা কি বেরিয়ে ফুলে গেল। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বর হোতে পারে।

অতএব ঝর্ণায় স্নানের আশা ছেড়ে আমরা বাথরুমের টবের জলেই স্নানপর্ব্ব সমাধা করলাম। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখা গেল বনের মধ্যে ছায়া পড়ে আসচে। চারিদিকেই বড় বড় শৈলচূড়া, জায়গাটাতে তাড়াতাড়ি ছায়া নেমে আসে।

বনের মধ্যে সেই ঝর্ণার কাছে গিয়ে আমরা সবাই বসলুম সেই অপরাহ্ণে।

এর নাম দিয়েচে এরা মাছের বাঁধ। বন-বিভাগ থেকে একটা বাঁধ

মত গেঁথে দিয়েচে বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর বুকে। তাতে তার গতিরোধ হয়নি, আরও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে আবেগে কংক্রিটের বাঁধ ডিঙিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পড়চে। এই স্থানটি এত সুন্দর, একবার বসলে উঠে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

এর সামনের দিকে সুউচ্চ পাহাড়, তার ঢালুতে বড় বড় শালগাছের বন, এখানে বসে শুধুই দেখা যায় শাল গাছের গুঁড়িগুলো নীচে থেকে ভিড় করে ওপরের দিকে উঠে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের ডানদিকে চওড়া মোটর-রোড বনবিভাগের নির্ম্মিত, কিন্তু এ পথে মোটর অপেক্ষা বাঘ ভালুকের যাতায়াত বেশি। যখন কন্ট্রাক্টরের দল বনের মধ্যে থেকে কাঠ কাটিয়ে নিয়ে যায়, তখন বছরের মধ্যে দিন কয়েক ওদের মোটরলরি বা মোটর যাতায়াত করে—ক্বচিৎ বন-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী মোটরে সফর করতে আসেন—মিটে গেল। সারা বছরে এ পথে আর লোকজন বড় বেশি যাতায়াত করে না। মোটরগাড়ী তো দূরের কথা।

অতিরিক্ত নির্জ্জন স্থান। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা লোক কোন দিকে চোখে পড়ে না—শুধু যা আমরাই আছি। ঋষিদের তপোবন এমনি নির্জ্জন জায়গাতেই ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী, এখানেই বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হৈ হট্টগোল-যুক্ত সহরের বুকে নয়।

পাশের পথ বেয়ে দু'জন লোক পুঁটলি কাঁধে কোথায় চলেছে। তাদের ডাকা হোল হো-ভাষায়, অবিশ্যি আমি ডাকিনি। আমি মিঃ সিংহকে বল্লুম—জিগ্যেস্ করুন ওরা কোথায় যাচ্ছে।

—সৌলবোরা যাব।

—এখান থেকে কতদূর ?

—সতের মাইল।

—সেখানে কেন ?

—সেখান থেকে টাকা আনবো—মাড়োয়াড়ীর গদি থেকে। আমরা কুলি। জঙ্গলে কাঠ কেটে ছিলাম, তার মজুরি।

—সন্দে বেলা যাচ্ছিস, ভয় করবে না ?

—কুইরা গ্রামে গিয়ে রাত কাটাবো।

হরদয়াল সিং সম্মুখের ছায়াচ্ছন্ন শৈল সানুর দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে বল্লেন—ঐরকম ঢালু জায়গায় আমাকে বুনো হাতীতে তাড়া করেছিল। সাইকেল না থাকলে সেদিন মারা পড়তাম।

আমার স্ত্রী বল্লেন—তাহলে আজ ওঠা যাক এখান থেকে—

সেই সময় বন-বিভাগের দুই উচ্চ কর্ম্মচারী আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বল্লেন—আচ্ছা, বলুন তো এ কংক্রিটের বাঁধটার আর কি উন্নতি করা যায় ?

হরদয়াল সিং এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উঁচু অফিসার। তিনি বল্লেন—আপনাদের পরামর্শটা একবার নিয়ে দেখি। আমি তো একরকম ভেবে রেখেছি, দেখি আপনারা কি রকম বলেন। 'আপনারা' অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী। এ যেন ডাক্তার বিধান রায় পরামর্শ চাইচেন পাশের বাড়ীর স্কুলমাষ্টার বন্ধুর কাছে—বলুন তো মশাই, এ রোগীটির সম্বন্ধে এখন কি ওষুধ দেওয়া যায় ? আপনার কি মত !

কিন্তু বিজ্ঞ ভেবেই তো পরামর্শ চাইছে। খেলো হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়। তাহলে লোকে মানে না। সুতরাং মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার ভান করলুম। যেন সক্কর বাঁধ কিংবা নতুন হাওড়া ব্রিজের প্ল্যান করবার ভার আমার ওপর পড়েছে।

হঠাৎ ভেবে দেখলুম, বাঁধটা এমন করে কেন যে বেঁধেছে, ওখান-

টাতে অমন নালা কেন করেছে, ওই জায়গাটাতে কংক্রিটের দেওয়ালের কাছে কয়েকটা ফোকর কেন—এই এখনো পর্য্যন্ত ভাল করে বুঝিনি। দু' একটা ইনটেলিজেণ্ট প্রশ্ন করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে এ ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতই পরিষ্কার।

সুতরাং বল্লুম—আচ্ছা, এ বাঁধ এখানে কি জন্যে দেওয়া হয়েছে?

হরদয়াল আমার মুখের দিকে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—কেন, মাছ ধরার জন্যে!

আমি বল্লাম—ও।

তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার আর কোন ইনটেলিজেণ্ট প্রশ্ন করতে সাহস হোল না। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ তখনও ঘোচেনি। এতে কি করে মাছ ধরা হবে, তা তখনও আমার মাথায় ঢোকেনি। বল্লুম—আচ্ছা বর্ষার সময় জল এতে আটকায় কি করে? জল তো উপছে পড়বে। মাছ দাঁড়াবে কোথায়?

হরদয়াল সিং প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন—ওই! ওই তো সমস্যা! ওই কথাই তো বলছিলাম—যাক! অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশেও লাগবে না? লেগেছে।

আমার স্ত্রী বল্লেন—চলো, বেলা প্রায় পড়ে এল। এসব জায়গা ভাল নয়। ওঠা যাক।

এ যাত্রা ভগবান মুখ রক্ষে করলেন। আমার স্ত্রী উঠে পড়তে সবাই উঠলাম সেখান থেকে।

বেলা পড়ে এসেছে। চারিধারের বনে এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসবার উপক্রম করছে। সুতরাং আর বেশীক্ষণ বাইরে আসা ঠিক হবে না।

আমি বল্লাম—এ জঙ্গলে আপনাদের বন্দুক না নিয়ে বেরোনো উচিত নয় কিন্তু।

মিঃ সিংহ বল্লেন—বন্দুক আমাদের আছে, তবে আমরা নিয়ে বেড়াই নে। ও একটা ঝঞ্ঝাট।

হরদয়াল সিং বল্লেন—আমরা ডিপার্টমেণ্টের অফিসার মশাই, বাঘে ভালুকে আমাদের কিছু বলবে না।

কয়েকটি হো-মেয়ে পাহাড়ের নীচে ভাত রেঁধে খাচ্ছে আজও। এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে ছুটি নিরুপকরণ তণ্ডুল সিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুসী উপছে পড়ছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট—তার কোন আঁচ এসে এখানে পৌঁছোয় নি। কেরোসিন তেল না পাওয়া গেলেই বা এদের কি, চিনির দাম চালের দাম চড়লেই বা এদের কি, কাপড়ের দাম বাড়লেই বা এদের কি। এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বনপ্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস জোগায়।

ওদের জিজ্ঞেস করা হোল—চাল যখন না পাওয়া যায়, তখন কি খাবি?

একটি মেয়ের নাম বুধ্‌নি কুই, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হোল তার কথাবার্ত্তা শুনে। কুই হো-জাতির কুমারী মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার হয়।

সে বল্লে—কেন, বনে খাওয়ার জিনিসের অভাব আছে নাকি?

—কি খাবার পাওয়া যায়?

—কন্দমূল। কত রকমের কন্দ পাওয়া যায় বনে। যারা জানে তারা তুলে আনে। বর্ষাকালে আমাদের দু-তিন মাস কন্দ খেয়েই চলে যায়।

কন্দ কথাটা সংস্কৃত হলেও বেমালুম ঢুকে পড়েছে হো-ভাষার মধ্যে, 'কান্দা' রূপে। বাংলাদেশের মেটে আলু জাতীয় একপ্রকার মূল এ জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, লাটিন নাম 'ডায়াস্ কোরিয়া', খেতেও বেশ সুস্বাদু। এ জাতীয় লতা এই সব বনে সাধারণতঃ শৈল সানুর অরণ্যে জন্মায়, নিম্নের উপত্যকাতেও কিছু কিছু আছে।

আমি হিন্দিতে প্রশ্ন করলাম—তোরা জঙ্গলে কন্দ তুলতে যাস, বাঘের ভয় করিস নে?

বুধ্‌নি কুই কিছু বুঝতে পারে না, শুধুই হাসে। এরা বাংলা তো দূরের কথা হিন্দিও বোঝে না বিহারে বাস ক'রে। কারণ এদের কাছে বাংলাও নেই বিহারও নেই—ওসব কথার কোন অর্থ নেই এদের কাছে। এই অরণ্যভূমি এদের মা, নিজের ক্রোড়ে আশৈশব এদের লালন পালন করেছে, ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল জুগিয়ে। একেই চেনে এরা।

হরদয়াল সিং হো-ভাষায় আবার আমার প্রশ্নটি ওদের করলেন। বুধ্‌নির উত্তর আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

বুধ্‌নি বল্লে—আমরা দল বেঁধে যাই, চার পাঁচজন এক সঙ্গে।

—বাঘ ভালুক দেখিস নে?

—মাঝে মাঝে দেখি বই কি।

—ভয় করে না?

—ভয় করলে কি চলে আমাদের! সঙ্গে তীর ধনুক থাকে। তবে বাঘ বেশি মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। হাতী বেশি খারাপ। হাতী তাড়া করে আসে—

—বাঘ কখনো তাড়া করে নি ?

—না বাবু, বাঘ কিছু বলে না।

—আর কি জানোয়ার দেখেচিস ?

—ভালুক আছে, ভালুকও বড় খারাপ। কখন যে ঘাড়ে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া সাপ আছে।

—কি সাপ ?

—শঙ্খচূড় সাপ আছে, মানুষকে তেড়ে কামড়াবে। ময়াল সাপ আছে, খুব মোটা, সেও মানুষকে ধরে। আমরা ময়াল সাপের মাংস খাই, বেশ ভাল মাংস।

সে বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে বনের গল্প করতে আমাদের এত ভাল লাগছিলো যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শাল পাতার পাত্রে ফেনসুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারীতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব্ব উপকরণ শূন্য—এই সকল অনাড়ম্বর জীবন-ধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্য আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসছে, এসময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।

হরদয়াল সিং বল্লেন, আমি একটা বড় সাপের কথা জানি।

আমি বল্লাম—কি সাপ ?

—পাইথন। আমার অধীনস্থ এক কর্ম্মচারী একবার পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শুনলেন জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় করে শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখলেন একটা প্রকাণ্ড পাইথন সাপ একটা ছোট হরিণকে প্রায় অর্দ্ধেক গিলে ফেলেছে।

—তারপর ?

—তারপর তিনি বনের মোটা লতা দিয়ে সাবধানে সাপটাকে বাঁধলেন। স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে সকলকে সংবাদ দিতেই—কুলি ও ফরেষ্ট গার্ডের দল হৈ হৈ করে গিয়ে সাপটাকে জখম করলে। তখন কিন্তু তারা ভেবেছিল যে সাপটা মরেই গেল। বিকেলের দিকে নিকটবর্ত্তী বন্যগ্রাম থেকে হো-অধিবাসীরা সাপের মাংস নিতে এসে দেখে মৃতপ্রায় সাপটা সেখান থেকে দৌড় মেরেছে। ওদের জান বড্ড কড়া। সাপটা লম্বায় প্রায় দশ ফুট ছিল।

—আপনি কত বড় সাপ দেখেছেন ?

—পালামৌ-এর জঙ্গলে একবার আঠার ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ এক পাহাড়ী জঙ্গলের ঝর্ণার ধারে গাছের গায় জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। পাইথন সাপরা সাধারণতঃ ঐ জায়গাতেই থাকে। হরিণ বা খরগোস জল খেতে এলে ঝপ্ করে তাদের উপরে পড়ে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হাড়গোড় চূর্ণ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। অনেক সময় সম্বর হরিণকেও রেহাই দেয় না।

—মানুষ দেখলে কিছু বলে ?

—সাবধানে না থাকলে একা মানুষকেও ছাড়ে না। আমি জানি উড়িষ্যার জঙ্গলে একবার একজন কাঠুরে একটা শুক্‌নো কাঠের গুঁড়ি কাটতে গিয়েছিল, গুঁড়িটার চারপাশে বড় বড় বন ছিল, বাইরের থেকে কিছু দেখা যায় না। কাঠুরেটা যেমন সেখানে গিয়েছে অমনি একটা প্রকাণ্ড পাইথন ওর একখানা পা জড়িয়ে ধরে ওকে ফেলে দিলে, তারপর লেজের প্রান্ত দিয়ে গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ওর সর্ব্বদেহে কুণ্ডলীর আকারে জড়াতে লাগল। ভাগ্যে ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল কিছুদূরে। ওর চীৎকারে তারা এসে পড়ে

সাপটাকে মেরে ফেলে। দু'তিন মাস ভোগবার পরে লোকটা বেঁচে যায়। আমি শুনেছি চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত সাপ এ জঙ্গলে দেখা গিয়েছে। ঝর্ণার ধারে গাছের উপরেই এ জাতীয় সাপ সাধারণতঃ বাস করে, কারণ ওখানেই ওদের শিকারের সুবিধা।

ক্রমে রাত্রি গভীর হলো, নানা প্রকার সাপ ও বাঘের গল্প শুনে আমাদের মনে একপ্রকার অস্পষ্ট রহস্যময় ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা সভ্য জগতের অধিবাসী, অন্ধকারময় বনানীর দৃশ্যও আমাদের নিকট গম্ভীর ও সুন্দর বটে, কিন্তু এ অনুভূতিও জাগিয়ে দেয় যে এ আমাদের পক্ষে বিদেশ। এখানে বুধ্নি কুই-এর মত হো-মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে বিচরণ করতে পারে, বন্য কার্পাস থেকে মোটা কাপড় বুনতে পারে, এরা কন্দমূল ফল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে, এরা কর জতা মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করে তেল তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমরা সঙ্গে করে সভ্য খাদ্য না আনলে এখানে তিন দিনও বাঁচবো না। তাছাড়া এসব বনে পাহাড়ী ঝর্ণার জলে স্নান করা বা ঝর্ণার জল পান করা আদৌ নিরাপদ নয়। ম্যালেরিয়ার ভয় যথেষ্টই আছে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা বাঁধা নিয়মে পাঁচ গ্রেণ করে কুইনাইন প্রত্যহ খান, তবুও ম্যালেরিয়ায় ভোগার কথা ওঁদের কাছেই শুনেছি। অথচ ঐ সবের জন্য নরনারীর সুন্দর স্বাস্থ্য, উচ্ছল জীবনানন্দ দেখে হিংসা হয়। জ্বর-জারির নামও ওরা শোনেনি। কুই-নাইন চক্ষেও দেখেনি। বিনা নুনে ও বিনা তরকারীতে মোটা চালের ভাত ও জঙ্গলের কন্দমূল খেয়ে অমন স্বাস্থ্য কি করে হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অরণ্যের রহস্য, অরণ্যের গোপন অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন থাকুক—আমরা শীতের রাতের শয্যা আশ্রয় করি।

পরদিন সকালে উঠে আমরা আবার মাছ ধরার বাঁধে গিয়ে

বসলাম। কত কি বন্য পক্ষীর কূজন, বনপুষ্পের সুবাস এই স্থানটিতে, সত্যই বড় ভাল লাগে। কাল রাত্রে হয়তো আমরা যেখানে বসে আছি সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জল খেতে এসেছিল। কংক্রিট বাঁধানো না হলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন থাকতো। আমাদের সাড়া পেয়ে একটা বনমোরগ কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের ঝিলিক খেলে উড়ে গভীর বনান্তরালে অদৃশ্য হোল।

আমি আবার বল্লুম—এখানে নাইবো।

মিঃ সিংহ বল্লেন—নাইলেই জ্বর হবে। এসব জল দেখতে ভাল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। হিমালয়ের যে কোন ঝর্ণার জল সুপেয় ও নিরাপদ—কিন্তু এখানে তা নয়। আমি যখন প্রথম বন-বিভাগে কাজ করতে আসি, অনভিজ্ঞতার দরুণ এই সব বন্য নদীর স্বচ্ছ জল নির্ব্বিচারে পান করতাম। ফলে ম্যালেরিয়া প্রায়ই হোত। পোড়াহাট ও সারেণ্ডা ফরেষ্ট ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত।

আমি বল্লাম—আপনি কবে বনবিভাগের চাকুরীতে যোগ দেন?

—১৯২৫ সালে প্রথম যেদিন জঙ্গলে চাকুরী করতে আসি, আমি তখন অনভিজ্ঞ যুবক, সবে বি. এস্-সি পাশ করেছি পাটনা কলেজ থেকে। আরা জেলায় আমার বাড়ী, বনের কোন ধারণাই নেই, আমাদের দেশে দু'দশটা আম গাছ ও মহুয়া গাছের সমষ্টিকে বন বলে। বিন্ধ্যাচলে একবার গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে, সেখানে সামান্য কিছু বন দেখি—তখন তাই আমার কাছে নিবিড়তম অরণ্য।

আমি কখনো বিন্ধ্যাচল যাইনি, আমার বন্ধু বিভূতি মুখুয্যে সেখানে গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছিলাম বিন্ধ্যাচলের মাথায় খুব জঙ্গল, সেখানে হরিণ ইত্যাদি চরে, সুতরাং আমি বল্লাম—কেন, শুনেছি সেখানেও বেশ বন আছে।

মিঃ সিংহ বল্লেন—সে এক ধরণের বন। এর তুলনায় কিছুই নয়। আমি প্রথম চাকুরী নিয়ে যাই সারেণ্ডা ফরেষ্ট। সে বন এর চেয়েও ভীষণ। ৪০০ বর্গ মাইল অরণ্যানী, এর মধ্যে খানকয়েক বন্যগ্রাম আছে। বন-বিভাগের কাজকর্ম্মের মজুরের জন্যে গবর্ণমেণ্ট জমি দিয়ে লোক বসিয়েছে। না দেখলে সে বিরাট অরণ্যের ধারণা হয় না।

—তারপর, আপনার অভিজ্ঞতা বলুন শুনি।

—সে এক গল্প। এখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিই চলুন। আজ আমাদের চিটিমিটি যেতে হবে। বৌদিদি তৈরি হয়ে নিন।

—চিটিমিটি কতদূর ?

—এখান থেকে ৪০।৪৫ মাইল পাহাড় ও বনের পথ। সকাল সকাল বেরুতে হবে। পথে আমার প্রথম চাকুরী জীবনের গল্প করতে করতে যাবো—আপনাদের লেখার খোরাক হবে।

বেলা দুটোর পরেই আমরা জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে মোটরে উঠিয়ে —রওনা হোলাম।

চিটিমিটি যাবার পথে মোটর পাহাড়-জঙ্গলের পথে এঁকে বেঁকে নামতে লাগলো বামিয়াবুরু থেকে। আমরা চলেচি···চলেচি ক্রমাগত চড়াই উতরাইয়ের পথে।

এক জায়গায় পাহাড়ের নীচে বাঁ-দিকের উপত্যকায় বন-বিভাগের 'রক্ষিত ভূমি'—এর রহস্য হচ্ছে এই যে, এই জায়গাতে প্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ইচ্ছামত বাড়তে। প্রকৃতির উপর কলম চালানো হয় নি। তাই এখানে বড় বড় ৮।১০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট শালগাছ যথেষ্ট—মোটা মোটা লতায় লতায় জড়াজড়ি, গাছপালার নীচেও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছোট গাছগাছালির।

আমরা পাহাড়ের গায়ে আবার দেখলুম খনিজ লবণের স্তর, বন্য জানোয়ার ছাড়া এ নুন কেউ ব্যবহার করে না। হরিণ, ভালুক, বাঘ এই তিনটি জন্তু বিশেষ করে। হাতীরা নুন খাওয়া দরকার বিবেচনা করে না নাকি, কেন তা জানি না। অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলো যখন বাঁকাভাবে এসে পড়ে এই খনিজ লবণের স্তরে, শাল অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে, তখন দলে দলে মৃগযূথ আসে নির্জ্জনে লবণের স্তর চাটতে, তাদের সে আনন্দলীলার ছবি হয়তো কবি ভবভূতি আঁকতে পারতেন যিনি প্রস্রবণ-পর্ব্বতের গম্ভীর মহিমা বর্ণনা করেচেন উত্তর-রামচরিতে—অতীত দিনের ভারতবর্ষের কি অদ্ভুত রূপ কল্পনায় ভেসে ওঠে এই পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে দাঁড়ালে।

হরদয়াল সিংকে বল্লাম—আপনারা এখান থেকে নুন বিক্রী করেন না?

—না। ওটা বন্যজন্তুদের ব্যবহারের জন্যেই।

—গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত?

—নিশ্চয়। এখানে শিকার করা নিষেধ।

—কি রকম?

—পূর্ব্বে এরকম হয়েচে। হরিণ নুন খেতে এসেচে দলে দলে, শিকারীদের মহেন্দ্রসুযোগ। লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।

—নিষ্ঠুরতার কাজ বই কি।

—এখন বনের সমস্ত salt lick-এ গবর্ণমেণ্টের খরদৃষ্টি। বন্দুক নিয়ে যাবার জো নেই।

মোটর থামানো হোল। মিঃ সিং বল্লেন—চলুন, দেখবেন কত জানোয়ারের পায়ের দাগ—

যেখানে পাহাড়ের গায়ে salt lick, তার নীচে জানোয়ারদের

চরবার সুবিধের জন্যে বা দাঁড়িয়ে নুনের স্তর চাটবার জন্যে বন-বিভাগ থেকে পাথর কেটে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নরম সাদা মাটিতে সত্যিই অনেক জন্তুর পদচিহ্ন।

হো-জাতীয় ফরেষ্ট গার্ড বল্লে—হরিণের পায়ের দাগই বেশি, ভালুকেরও আছে—কোঙরার আছে—

আমি বল্লাম—কোঙরা কি?

মিঃ সিং বল্লেন—বার্কিং ডিয়ার—

—কত বড়?

—একটা বড় খাসি ছাগলের মত। বামিরাবুরুতে সেদিন রাত্রে যার ডাক শুনেছিলেন—

ফরেষ্ট গার্ড বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ একদম দেখছি না হুজুর।

আরও মাইল সাতেক গিয়ে আমাদের গাড়ী সমতলভূমিতে নামলো। সেখানকার আরও মনোহারী শোভা—বাঁ দিকে একটা পাহাড় চলেচে—বন সেখানে তত ঘন না হোলেও বড় বড় শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ ও গোল-গোলি ফুলের গাছে সমস্ত পাহাড়ের সানুদেশ ভর্ত্তি। এই ফুলের গাছ দেখতে আমাদের দেশের আমড়া গাছের মত—অথচ প্রথম বসন্তে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র শ্বেতাভ বৃক্ষগুলিতে যখন সূর্য্যমুখী ফুলের মত বড় বড় ফুল ফোটে—কালো কোয়ার্ট জাইট পাথরের পটভূমিতে, মেঘশূন্য নীল আকাশের তলায়, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে কোন্ সৌন্দর্য্যের মায়ালোকের মধ্যে মনকে একেবারে তলিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে যায় যেন!

যতদূর যাই, সমতলের শোভা আর একরকম। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বনে তাদের ঢাকেনি, কোথাও দু' এক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে নেমে নদী চলেচে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে; কোথাও দু' একটি বন্যগ্রাম···

আমার স্ত্রী ক্রমাগত বলছেন—আহা, বেশ জায়গা, ছাখো ছাখো কেমন ঐ গাঁ-খানা পাহাড়ের কোলে—এখানে একটা বাড়ী করলে হয় না?

আবার কিছুদূর গিয়ে—

—ছাখো ছাখো কি সুন্দর ঝর্ণাটি। বাঁশবন—এখানে একটা বাড়ী করলে হয়—

ডজন খানেক জায়গায় বাড়ী তৈরি করবার পরামর্শ শুনে শুনে মিঃ সিং বল্লেন—কিন্তু একটা ব্যাপার মিসেস ব্যানার্জ্জি—বাড়ী তো অনেকগুলো করবার প্রস্তাব করলেন—এসব জায়গায় বাস করতে পারবেন?

আমার স্ত্রী বল্লেন—কেন?

—খাবেন কি? রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে এ সব গাঁয়ে শুধু হো-জাতীয় লোকেরা বাস করে—দোকান টোকান নাই—

—ওরা জিনিস কোথায় পায়?

—কোনো জিনিসের দরকার নেই ওদের—দেখেই তো এলেন বামিরাবুরুতে—

কিন্তু আমার স্ত্রীর দোষ নেই, সত্যিই মনে হয় এখানে নানা জায়গায় শুধু বাড়ী করি আর বাস করি। কতবার আমার নিজের মনেও কি উদয় হয়নি সে কথা? বড় বাড়ী নয়, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। পাহাড়ী বেণুবনের ছায়ায়, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশি বাজবে, পর্ণকুটীরে শুয়ে শুয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুধু শুনবো আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে!

একটা গ্রামে পাহাড়ের নীচে হাট বসেচে। বল্লাম এটা কি গ্রাম? মিঃ সিং বল্লেন—ম্যাপ দেখে বলে দিচ্ছি—

মোটর থামানো হোল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম—এই বন পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কি জিনিস এখানে কেনা বেচা হচ্ছে দেখতে হবে বৈকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্চি, একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসচে দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম তাদের কাছে।

আমার স্ত্রী বল্লেন—ঐ তো কালকের সেই মেয়েটি—সেই বুধ্‌নি কুই—

মিঃ সিং হো-ভাষায় ওদের কি বল্লেন। ওরাও কি উত্তর দিলে হেসে হেসে।

আমি বল্লাম—কি বলচে ওরা?

—বলচে, বাবুরা হাট দেখতে এলি?

—মেয়েগুলি কোত্থেকে এসেচে?

—ওরা বুধ্‌নি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব। হাট দেখতে এসেচে। জিনিস-পত্র কিনুক না কিনুক, ভাল সাজগোজ করে এদেশে সবাই হাটে আসবেই। হাট ওদের উৎসবের জায়গা। এখানেই সাত দিন পরে পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়—হাটের দিন ওদের কাছে একটা আমোদের দিন—

আমরা সকলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অনেক হো-নরনারী জড়ো হয়েচে। মেয়েদের চুলে প্রচুর করন্‌জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তীর ধনুক। তীর ধনুক না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথ চলে না।

বিক্রী হচ্ছে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণতঃ বিক্রী হয়ে থাকে বীচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুঁট্‌কি মাছ, জেঁদা অর্থাৎ

নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, বাখর অর্থাৎ মহুয়ার মদ তৈরী করবার মসলা, দেখতে কদমার মত ; সুন্দর সরু সীতাশাল চাল, মাটির হাঁড়ীকুঁড়ী, মহুয়ার তেল, করন্‌জার তেল এবং তাঁতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা। এদেশে মোটা চাল তত বেশী দেখা যায় না, যত দেখা যায় সরু সাদা ধবধবে সীতাশাল চাল। পাহাড়ী পাথুরে জমি নাকি সরু ধানের পক্ষে অনুকূল।

বুধ্‌নি কুইকে জিজ্ঞেস করা হোল—কি কিনবি রে হাটে ?

সে হাসতে হাসতে বল্লে—কিছুই না।

—তবে কেন এসেচিস্‌ ?

—মুরগীর লড়াই দেখতে।

হ্যাঁ—এই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। দশক্রোশ হেঁটে এরা আসতে পারে মুরগীর লড়াই দেখতে।

—কোথায় মুরগীর লড়াই হচ্চে রে ?

—হয়নি। ওই গাছের তলায় হবে। হাট ভেঙে গেলে হবে, নয়তো মুরগীর লড়াই আরম্ভ হোলে হাটে কে থাকবে ?

কথাটা সত্যি বলেচে বুধ্‌নি। কেনা বেচা, ব্যবসা বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিস। এর কি দাম আছে জীবনে ? আসল জিনিস হোল মুরগীর লড়াই। গাছের তলায় মাদল বাজচে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা ছুটো লড়াইয়ে-মোরগের ঝটাপটি দেখচে, টুপটাপ মহুয়া ফুল ঝরে পড়চে ওদের মাথায় আশে পাশে, সামনে দূরে নীল নীল শৈলমালা···

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ মুহূর্ত্ত।

এদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার বিষয় বটে।

কি জানি হয়তো চক্রধরপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শৃঙ্গানপুরের

গিরিগুহার চিত্রাবলী এদের পূর্ব্বপুরুষেরা এঁকেছিল কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে!

আমার স্ত্রী নারীসুলভ বস্ত্রপ্রিয়তা প্রদর্শন করে বল্লেন—একখানা নক্‌সা করা চাদর কিনবো—

আমি চাদর ক্রয়ের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখালুম অবিশ্যি, কিন্তু কিছুই খাটলো না।

আবার আমরা পথে বেরুই। এবার কি বেজায় ধুলো সুরু হোল। ষ্টীয়ারিংয়ের তলাকার কোন্ ফাঁক দিয়ে ফোয়ারা থেকে জল বেরুবার মত ধুলো ঢুকতে লাগলো।

আর একটা বন্যগ্রাম ও পথের পাশে তাদের মৃতদের উদ্দেশে প্রোথিত প্রস্তররাজি। এইগুলো সেখানেই দেখি, সেখানে প্রায়ই থাকে একটা প্রাচীন বট বা মহুয়া গাছ। পাহাড়ের পাশে যদি হয় মনে কেমন এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে আসে।

এমনি এক সমাধি স্থানের বর্ণনা করেছি আমার লেখা 'আরণ্যক'-এ। সে স্থান গয়া জেলার প্রান্তে, দক্ষিণ বিহারের শৈলমালার নিবিড়তম অভ্যন্তরে অবস্থিত—অথচ আজ সেই সব দৃশ্যের কথাই আমার মনে আবার নিয়ে আসে এই বন্যগ্রাম ও এদের সমাধি প্রস্তরের চৌরস সারি।

তিনটি বন্যগ্রাম পার হয়ে তবে চিটিমিটি। গ্রামগুলির নাম ও ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে আমার স্ত্রী একটি ছড়া তৈরী করলেন—

আগে হোল পেটাপেটি
বাঁকে, রুয়াউলি, করজুলি
তারপর চিটিমিটি—

এর কবিত্ব প্রশংসনীয় না হোলেও, নামগুলো মনে রাখার সুবিধে হয়। যেমন মুখস্থ করেছিলুম কোন ছেলেবেলার—

যোলশ সাতাশ অব্দে জাহাঙ্গীর ম'ল
সাজাহান ভারতের বাদশাহ হোল—

এখন কত উপকার দেয় !

বেলা চলে যাচ্চে, এমন সময় উপরোক্ত ছড়ার প্রথম গ্রামটির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। এবার ধুলো-ভরা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথে উঠচি, একটা পাহাড়ের ওপারই পেটাপেটি গ্রাম! এখানে যদি বা বাড়ী করে বাস বারবার লোভ সম্বরণ করা চলে, কিন্তু পরবর্ত্তী তিনখানি গ্রামের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষকে সভ্য জগতের কথা একেবারে ভুলিয়ে দেয়।

আমি এই সময় মিঃ সিংহকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার চাকুরী জীবনের প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতাটার কথা বল্লেন না ?

—চলুন, চিটিমিটি বাংলোতে বসে চা খেতে খেতে আরাম করে শুনবেন। সে সত্যিই শোনবার মত বটে—

—কোনো বন্যজন্তুর হাতে পড়েছিলেন ?

—ঠিক সে ভাবের নয়, তবে পড়লে বিস্মিত হবার কারণ ছিল না।

এমন একটা উঁচু জায়গা দিয়ে আমাদের মোটর যাচ্চে যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকা বাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্চি —কখনও শৈলগাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে আবার কখনও দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেচে আগে আগে।

বাঁকে গ্রামখানির দুদিকে পাহাড়, সামনে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু শব্দে। পাহাড়ের ওপরে বন্যবাঁশের বন, শালবন, শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ। যার কোথাও বাড়ী করবার প্রবৃত্তি হয় না— নিতান্ত আরব বেদুইনের মত যে ছন্নছাড়া ও ভ্রাম্যমান—তারও অভিলাষ জাগবে মনে ঐ পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে কিছুদিন বাস করি !

রুয়াউলি।

সাদা কোয়ার্জ্জ পাথরের ridge একদিকে ঢেউখেলানো পাহাড়—অধিত্যকায় মাঝে মাঝে শালবন। পাহাড়ের গায়ে রোদ পড়ে বেশ দেখাচ্চে।...

করজুলি।

দূরে একটা গ্রাম দেখচি থাকে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেচে। করজুলিতে হো-অধিবাসীদের ঘরগুলি শালপাতায় ছাওয়া, রাঙামাটির দেওয়াল, পাহাড়ের গম্বুজ উঠেচে দূরের কালো বনরেখার ওপরে; জ্যোৎস্নারাত্রে এই গ্রামগুলি মায়াময় হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারচি।

বেলা যাবার দেরি নেই—পশ্চিম দিগন্তে দূর বরকেলা শৈলশ্রেণীর ওপরে সূর্য্য ঝুঁকে পড়েচে। এমন সময় মোটর আবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে সুরু করলে।

মিঃ সিংহ বল্লেন—ওই দেখুন চিটিমিটি বাংলো দেখা যাচ্চে পাহাড়ের মাথায়—ওখান থেকে ওপারের সমতলভূমির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়—

একটু পরে বনপথে উঠে আমাদের গাড়ী একটা ছোট বাংলোর সামনে দাঁড়ালো।

চিটিমিটি বাংলোটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট বাংলো, অনেক নীচে সমতল ভূমি, সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট। কার্সিয়ং থেকে নীচের দিকে যেমন সমতল ভূমি দেখা যায়, অনেকটা তেমনি দৃশ্য। পেছন দিকে পাহাড়ের নীচে উপত্যকায় বনের আড়ালে করজুলি গ্রামের হো-অধিবাসীরা মাদল বাজিয়ে গান ধরেছে। বাংলোর মধ্যে ঢুকে দেখা গেল অনেকদিন এখানে কেউ না আসার

দরুণ আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় নেই। দুটি মাত্র ছোট ঘর। রাত্রে এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা।

হরদয়াল সিং প্রস্তাব কল্লেন এই রাত্রেই চাঁইবাসা ফেরা যাক।

এই বরকেলা শৈলমালার নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে বিপজ্জনক রোড ঘুরে ঘুরে মোটর নীচের সমতল ভূমিতে নেমেচে। অন্ধকারের মধ্যে সে পথে মোটরে যাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। অগণন জোনাকীপুঞ্জ জ্বলছে গাছের ডালে পাতায় পাতায়। দশ বিশ হাত অন্তর ফাঁকা। একপাশে গভীর খাদ। তার পরেই বনাবৃত উপত্যকা। ওপারে একটা বেজায় উঁচু পাহাড় খাড়া উঠেচে। মোটর খুব জোরে চলতে পারচে না।

আমি বললুম—কোন বিপদ নেই তো?

হরদয়াল সিং বল্লেন—বুনো হাতী ছাড়া।

—বুনো হাতীর হাতে পড়েচেন এমন অবস্থায়?

—একবার পড়েছিলুম। এই সংকীর্ণ পথে এমন অন্ধকারে।

—বলেন কি?

—মোটরে যাচ্চি, হাতী সামনে এসে দাঁড়ালো—আর নড়ে না। মোটর ফেরাবার জায়গা নেই। অগত্যা মোটর থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতী পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে শুড় নাড়তে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে কেন যে চলে গেল তার কারণ কিছু বলতে পারবো না। সমস্ত রাতও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

মিঃ সিংহ বল্লেন—এই সব পথে বিশ্বাস নেই। পরের বাঁকেই হাতী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বরকেলা পাহাড়ে হাতীর বড় উপদ্রব।

আমরা পাহাড়ের পথে নামছিলুম। আশে পাশে ঘনীভূত অন্ধকার। নির্জ্জন অরণ্যপথ—গাড়ীতে অন্ধকারের মধ্যে আমরা

চার পাঁচটি প্রাণী, কোনোদিকে লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না, দূরে বা নিকটে একটা আলো কোথাও জ্বলে না—কেবল নৈশ আকাশে অগণন ঝক্‌ঝকে নক্ষত্ররাজি, গাছের ডালে ডালে জোনাকীর ঝাঁক, গাড়ীর মধ্যে দু' একটা জ্বলন্ত সিগারেটের ক্ষীণ দীপ্তি।

গল্প যদি শুনতে হয় তবে এই সময়।

আমি বল্লুম—চা আছে ফ্লাস্কে ?

মিঃ সিংহের আরদালি বল্লে, আছে হুজুর।

আমি প্রস্তাব করলাম গাড়ী একটা ভাল জায়গা দেখে থামিয়ে চা খাওয়া এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক্‌। এই সময়ে মিঃ সিংহ তাঁর প্রথম চাকরী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। গল্পটা মুলতুবী রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

আরও পনেরো মিনিট পরে বাঁদিকে একটা বড় শিলাখণ্ড পাওয়া গেল, যেন সান বাঁধানো চাতাল। এর পাশে আমাদের গাড়ী থামানো হোল। বেশ আরামে বসে চা খাওয়া গেল পাথরের চাতালে বসে। পাশের খাদে যেন একরাশ নিবিড় অন্ধকারে জমে। দু' একটা নৈশ পাখীর ডাক বনের মধ্যে। মিঃ সিংহ বল্লেন—সে হোল ১৯২২ সালের কথা। সে বারে আমি প্রথম বন-বিভাগে ট্রেনিং-এ গেলাম। অর্ডার পেলাম পোংসাতে গিয়ে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীর কাছে কাজ শিখতে হবে।

—পোংসা কোথায় ?

—যখনকার কথা বলছি, তখন আমিও জানতাম না। শুধু এইটুকু আমায় বলে দেওয়া হয়েছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের মনোহরপুর ষ্টেশনে নেমে সেখানে যেতে হয়।

—কত মাইল ?

—ষোল সতেরো মাইল।

—রাস্তা ভালো ?

—সেইটাই আমার গল্পের বিষয়। এ গল্প প্রধানত রাস্তার গল্প। আজ এই অন্ধকার রাত্রে বনের পথে সে কথা বড় বেশি করে মনে হচ্ছে। শুনুন তারপর। মনোহরপুর ষ্টেশনে নেমে ওখানকার বন-বিভাগের বাংলোতে লোকজনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদেরই মুখে শুনলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে ১৫।১৬ মাইল দূর। বেলা তিনটা। আমার সঙ্গে সাইকেল ছিল, দেশ থেকে এক পাচক ঠাকুরও এনেছিলাম। আমি ভাবলাম এ আর এমন বেশি দূর কি। সাইকেলে চট করে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম বাধা হোল পাচক ঠাকুর। সে পথ চেনে না। একা এ পথে যেতে পারবে না। অগত্যা আমরা কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে পদব্রজে কইনা নদী পার হয়ে ওপারে গেলাম। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকালই ভালবাসি, নীল পাহাড়শ্রেণী দেখে মনে বড় আনন্দ হোল। ওখান থেকে যেতে পথের ধারে ধারে দু'দশটি শালগাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়, তার ওপর গাছ-পালা। আমার বন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই পূর্ব্বেই বলেছি। বিন্ধ্যাচলে বন দেখে ভেবেছিলাম এই বুঝি নিবিড় অরণ্য। এর চেয়ে আর কি বড় বন হতে পারে ? আমার দেশ আরা জেলায়, বন বলে কোনো জিনিস নেই, শুধু ক্ষেত খামার আর চষা জমি। জমির বড় দাম, এতটুকু পড়তে পায় না।

আমি বল্লাম—কত দাম জমির ?

—পাঁচ ছ'শো টাকা বিঘে। তাও ভাববেন না খুব ভাল জমি।

—তারপর ?

—তারপর মাইল পাঁচেক পথ এসে কোল-বোংসা বলে একটা ছোট গ্রাম। হো-জাতীয় অধিবাসীদের বাস। সেখানে এসে কুলিরা আর যেতে চাইলে না। তারা বল্লে সে গ্রামেই তাদের বাড়ী। আর এক পাও তারা নড়বে না, তাদের মজুরি চুকিয়ে দেওয়া হোক। অগত্যা আমাদের সেখানে রাত কাটাতে হোল গ্রামের প্রান্তে বন-বিভাগের একটা ছোট খড়ের ঘরে। ঘরটাতে কেউ থাকে না, ঘরের চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ, সারা রাত্রি এমন শিশির পড়তে লাগলো যেন মনে হচ্ছিল টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা ছিল কার্ত্তিক মাস।

—খেলেন কি ?

—আমার পাচক ঠাকুর ছুটি ভাত রান্না করলে, তাই খেয়ে শুয়ে পড়ি। পরদিন সকালে উঠে জিজ্ঞেস করে জানলাম পোংসা সেখান থেকে দশ মাইল রাস্তা। পাচককে বল্লাম কুলি জোগাড় করে আমার পরে পোংসা রওনা হয়ো। আমি এখনই সাইকেলে চল্লাম। ঠাকুর বারণ করলে এখন যেতে। আমি বল্লাম বন তো ফুরিয়ে গিয়েছে। এ রাস্তা বিশেষ খারাপ হবে না। বন যে আরম্ভ হয়নি তখন কি তা জানি ?

মিঃ হরদয়াল সিং বল্লেন—পোংসাতে আমিও ছিলাম ট্রেনিং-এর সময়। দেরাছুন ফরেষ্ট কলেজে যাওয়ার পূর্ব্বে। ওখানে বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানীর আপিস ছিল সে সময়।

মিঃ সিংহ বল্লেন—কোল-বোংসা থেকে মাইল খানেক রাস্তা বেশ বন পেলাম। কিন্তু নিকটেই গ্রামের গরু মহিষ চরছে, মানুষে কাঠ কাটচে, সুতরাং তত ভয় হবার কথা নয়। তারপরে মহাদেবশাল বলে একটা ঝর্ণা পার হলাম, নিবিড় বনের মধ্যে ঝির ঝির করে বইছে

পাথরের ওপর দিয়ে। ভাবলাম, বন আর কতদূর হবে? এই শেষ হয়ে গেল। ক্রমে পাহাড়ের ওপর রাস্তা উঠতে লাগলো, উঠচে উঠচে, সাইকেলে যেতে যেতে পা ভেঙে পড়চে, বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্চে, এদিকে বন ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে লাগলো। দেহহীন, জনমানবহীন সুনির্জ্জন সুনিবিড় বনানী সেই ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের পাশে। আরা জেলার অধিবাসী আমি, অমনতর বনের ধারণাই নেই আমার। ভয়ে বিস্ময়ে আমি কেমন হয়ে গেলাম। একটা মানুষ কি নেই সেই পথে? যত যাই পথেরও কি শেষ নেই? অত বেলা হয়েছে কিন্তু সে বনে ভাল করে তখনও সূর্য্যের কিরণ পড়েনি। এ রকম আবার বন হয়!

আমরা যেখানে পাথরের চাতালে বসে গল্পটা শুনছিলাম, বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সানুপ্রদেশের বনানীর মধ্যে সেখানে অন্ধকারে চারিদিকে যেন মিঃ সিংহের এ অভিজ্ঞতা নিজেদের কাছেই বাস্তব হয়ে উঠেছিল। এ গল্প শুনতে হয় এমন জায়গাতে বসেই বটে।

মিঃ সিংহ বল্লেন—তারপর এক জায়গায় আমার সত্যই মনে হোল পোংসা নামক জায়গাতে বেঁচে থাকতে আর বোধ হয় পৌঁছবো না। তখন নতুন বিয়ে করেছি! মনে হোল এখানে বসে পকেটের কাগজ নিয়ে একটা উইল লিখে রাখি। এই যেন হাতী কি বাঘ এসে ঘাড়ে পড়লো বলে। আর কোন আশাই নেই। শুধু দাঁতে দাঁতে চেপে মনের জোরে পথ চললাম। অবশেষে মন ক্রমে যেন একটু পাতলা হয়ে এল। একটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট বাংলো পাওয়া গেল। লোকালয় দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তখন বেলা তিনটে। জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে আরও মাইল ছয়েক। কোল-বোংসা যে বলেছিল দশ মাইল,

সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আবার বন। তবে আমার মনে অনেকখানি ভরসা হয়েছে।

আমি বল্লাম, কখন পৌঁছুলেন -

—প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওপরওয়ালা কর্ম্মচারী ছিলেন এক পাঞ্জাবী, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বাসা দিলেন প্রায় আধ মাইল দূরে এক ছোট্ট খড়ের ঘরে। সারাদিন সাইকেল চড়ার পরিশ্রমের পরে সেই ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর বিনা বিছানাতে বিনা লেপে শুয়ে রইলাম। দুর্দ্দান্ত শীত। অনেক রাত্রে পাঞ্জাবী কর্ম্মচারীর চাকর আমায় খানকতক রুটি আর একটু ডাল দিয়ে গেল। পরদিন দুপুরের সময় আমার পাচক এসে পৌঁছুল আমার জিনিসপত্র নিয়ে। সে নাকি ঐ রাস্তায় একটা বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। বিচিত্র নয়!

মিঃ সিংহ গল্প শেষ করলেন। আমরা আবার মোটরে উঠে সৈদবার পথে বরকেলা পাহাড়শ্রেণী থেকে নেমে এসে রাঁচি-চক্রধরপুর-রোড ধরলাম। রাত দশটায় চাঁইবাসা।

আমি বল্লাম—পোংসায় আর কিছু ঘটেনি আপনার চাকুরীর প্রথম দিনে?

মিঃ সিংহ বল্লেন—আর বিশেষ কিছু নয়, তবে রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। কেবল ভাবি, যেমন বন জঙ্গল দেখচি, হয়তো বাঘ ভালুক ঢুকেই পড়বে ঘরের মধ্যে। তার উপর ভীষণ শীত, আমার সঙ্গে একখানা মাত্র আলোয়ান এবং সেই একমাত্র শীতবস্ত্র। এত অসুবিধের মধ্যে ঘুম যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হয়েছিল।

—কোথায় শোবার জায়গা দিয়েছিল?

—একটা ছোট্ট ঘরে। তার একদিকে জঙ্গল ও ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী ঝর্ণা। গ্রাম থেকে সিকি মাইল দূরে।

এ সব প্রশ্ন সেদিন অত খুঁটিনাটি ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম এবং তার উত্তর এত আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম যে, গৃহ ও পরিবার বর্গের অঙ্ক থেকে সদ্যবিচ্যুত একটি অনভিজ্ঞ যুবকের সে দিন ও রাত্রির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং পথের পাশে অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় চা পানের পরের বৎসর আমি নিজে যখন মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে মনোহরপুর থেকে কোল-বোংসা হয়ে পোংসা এলুম এমন কি ছোটনাশরা গ্রামের সেই কুঁড়েঘর দেখলাম যেখানে মিঃ সিংহ রাত কাটিয়েছিলেন—তখন আমার কল্পনায় অঙ্কিত সব ছবির সঙ্গে এত গরমিল হোল, যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম।

গত ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি মিঃ সিংহের সঙ্গে সিংভূমের বিখ্যাত সারাণ্ডা ফরেষ্ট ভ্রমণ করি। মিঃ সিংহ তিন মাসের জন্যে সারাণ্ডা বিভাগে বদলি হয়েছিলেন, আমিও ঐ দুই মাসের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে ওঁর সঙ্গে সারাণ্ডা ভ্রমণে বের হই।

মনোহরপুর থেকে মোটর ছেড়েই আমরা কইনা বলে একটি পার্ব্বত্য নদী পার হলুম।

তারপর রাঙা মাটির আঁকা বাঁকা পথ এঁকে বেঁকে যেতে যেতে সাত আট মাইল দূরবর্ত্তী সপ্তশত শৈলযুক্ত সারাণ্ডা (Saranda of seven hundred hills) অরণ্যপ্রান্তরের নীল রেখার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, পথের পাশে এখানে একটা ডুংরি (অনুচ্চ পাহাড়) ওখানে একটা ছোট শালবন, কোথাও বা একটা হো-অধিবাসীদের গ্রাম।

মিঃ সিংহ বল্লেন—এই সেই পথ, মনে আছে আমার গল্প ?

আমি তখনও পর্য্যন্ত বন দেখিনি সে পথে। বল্লাম—কেন এ পথ মন্দ নয় তো ?

মাইল ছ' সাত পরে কোল-বোংসা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। উনি বল্লেন—চলুন, এ গ্রামে যেখানে রাত্রি যাপন করেছিলাম দেখিয়ে আনি।

মোটর থেকে নেমে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর ক্ষুদ্র একটি কুটিরের সামনে এক বৃদ্ধ লোক খামারে ধান ঝাড়চে, কুমড়োর লতা উঠেচে কুটিরের খড়ে-ছাওয়া-চালের ওপর; কুটিরের দাওয়া থেকে সম্মুখের সারাণ্ডা-বনকান্তারের শৈল-শ্রেণীর গম্ভীর দৃশ্য হিমালয়ের পার্ব্বত্যভূমির সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হিংসে হোল বৃদ্ধ ব্যক্তিটির ওপর, এমন সুন্দর জায়গায় ওর বাড়ী।

মিঃ সিংহ তাকে বল্লেন—কি জাত?

লোকটা বল্লে—গোঁসাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এ দেশে ব্রাহ্মণকে বলে 'গোঁসাই'। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি ওর গলায় মলিন পৈতে ঝুলচে বটে।

সে পাহাড় থেকে আমরা ওপারের সমতলভূমিতে নেমে আসল গ্রামে পৌঁছুলাম।

গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা কুঁড়েঘর দেখিয়ে মিঃ সিংহ বল্লেন এই ঘরে সেদিন রাত কাটিয়েছিলাম।

কুটিরটির চারধারে বড় বড় শালগাছ, একটু দূরে একটা কালো পাথরের ডুংরি অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। সে পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের (Buteasuperba) জড়াজড়ি। বসন্তকালে রক্ত পলাশের মেলা যখন সুরু হয়ে যাবে বনে বনে, তখন যে কোনো কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকের পক্ষে কিংবা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন সাধুর পক্ষে এই নিভৃতি বনকুঞ্জবর্ত্তী কুটিরটি অতি লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

কোল-বোংসা গ্রামে বাস করে হো-জাতীয় অধিবাসীরা, ঘরদোর তাদের অত্যন্ত খারাপ—নিতান্ত দীনহীন, কিন্তু তারা এক রমণীয় পার্ব্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্ব্বদা থাকে, ওদের কুটিরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা ও বনকান্তারের কি শোভন রূপটিই চোখের সামনে ফুটে উঠে। অনেক বড়লোকের বাড়ী হয়তো কোনো এঁদো গলির মধ্যে এক ইটের স্তূপ মাত্র, দরজার একপাশে দেখা যাবে ডাষ্টবিন, গোটা-কতক কাক আর খেঁকিকুকুর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্চে—এমন নীল বনানীর শোভা, এমন রক্তপলাশের উৎসব সেখানে কোথায় ?

কোল-বোংসা গ্রাম ছেড়ে মহাদেবশাল বলে একটি পার্ব্বত্য নদী নিবিড় বনের মধ্যে বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেচে। নিভৃত ছায়াবিতান রচনা করেচে সারাণ্ডা অরণ্যপ্রান্ত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে মোটর উঠতে লাগলো। পরক্ষণেই কি নিবিড় বন সুরু হোল রাস্তার দুদিকে, কি দূর সমতল ভূমির দৃশ্য ! ওই দূরে মনোহরপুর ইষ্টিশান, ওই ট্রেনের ধোঁয়া উড়চে, ওই সেই কোল-বোংসা গ্রামে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গোঁসাইয়ের কুটির ও খামার।

এক এক জায়গায় বনের গম্ভীর দৃশ্য মনে ভয়ের সঞ্চার করে, তবুও আমরা মোটরে চলেচি, সঙ্গে এতগুলো লোক। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ যুবক যেদিন এই বন্যজন্তু অধ্যুষিত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে একা সাইকেলে গিয়েছিল, তার সেদিনকার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলাম।

মিঃ সিংহ বল্লেন—এই সেই পথ, দাদা।

—বেশ বুঝতে পারচি।

—এখনও কিছু দেখেননি। আরও আগে চলুন।

চৈতন্যদেবের সেই "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"! বন কি নিবিড়

হয়ে উঠচে, কাছির মত মোটা মোটা চীহড় লতা (Bonhinia Vallai) বিশাল বনস্পতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকার লতাকুঞ্জের সৃষ্টি করেচে পদে পদে, অত বেলাতেও সূর্য্যের আলো পড়েনি।

একটা জায়গা দেখিয়ে মিঃ সিংহ বল্লেন এখানে এসে এমন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে ভাবলুম একটা উইল লিখি ও পকেটে একখানা পরিচয় রাখি।

আমি বল্লাম—বন্যজন্তু আছে এখানে ?

—সারণ্ডাতে বন্যজন্তু নেই ? বাঘ বলুন, বুনো হাতী বলুন, ভালুক বলুন—অভাব কি ? বাইসন, সম্বর হরিণ পর্য্যন্ত। বাদ নেই কিছু।

দেড় ঘণ্টা মোটর চালানোর পর বন একটু পরিষ্কার হোল। দূরে দেখা গেল লাল টালির দু'চারখানা ঘরবাড়ী। মিঃ সিংহ বল্লেন—ওই হোল পোংসা—

পোংসাতে বি. টি. টি. কোম্পানীর (ব্রিটিশ টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানী) বড় আড্ডা। এই কোম্পানীর অংশীদারেরা হচ্চে বিলাতের বড় লোকেরা, এমন কি পার্লামেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে এদের মধ্যে। বিদেশীর অর্থে আমাদের দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্চে। গত ত্রিশ বৎসরে সিংভূমের এই অপূর্ব্ব অরণ্যভূমি অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করচে বিলাতের বড় মানুষেরা, আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।

সেই বনাবৃত স্থানে ছোট্ট একটি গ্রাম। একখানা সাহেবী ফ্যাসানের খড়ের বাংলো-ঘরের মধ্য থেকে একজন সাহেব বার হয়ে এল আমাদের মোটরের শব্দ শুনে।

মিঃ সিংহ বল্লেন—শুনি বি. টি. টি. কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার ভালো লোক।

একদিকে একটা লম্বা খড়ের ব্যারাক মত বাড়ী। একটি বাঙালী বিধবা মহিলা একখানা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে। শুনলাম ও বাড়ীখানা কেরাণীদের থাকবার জায়গা। এতদূরে এই বনের মধ্যে দু-একটি বাঙালী পরিবার কি ভাবে নির্জ্জন জীবন যাপন করচেন চাকুরীর খাতিরে—ভাবতে ভালো লাগে।

মিঃ লক্‌নারের মোটর আছে, তিনি মোটরে মনোহরপুর যেতে পারেন মানুষের মুখ দেখতে, কিংবা যেতে পারেন একুশ মাইল দূরবর্ত্তী ডুইয়া ও চিড়িয়া খনিতে, সেখানে শ্বেতকায় ম্যানেজার আছেন। কিন্তু এই বাঙালী কেরাণীদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা জেলে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে কিভাবে দিন কাটান, কি করে বলবো?

আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্ত্তে গাড়ী থেকে নেমে ওই বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ীতে চলে যাই, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ওদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিই—ঠিক বলতে পারি ওরাও খুব খুসী হবেন আমাকে পেয়ে।

পোংসা থেকে কিছুদূর এসে আবার আমরা ঘন বনের পথে ঢুকে পড়লুম, বাঙালী বাবুদের বাসা ও সাহেবদের বাংলো অনেক পেছনে পড়ে রইল।

মিঃ সিংহের সঙ্গে পোংসা থেকে বার হয়ে কিছুদূরে বনপ্রান্তে এসেচি, একটা লোককে খাটিয়াতে শুইয়ে চারজন কুলিতে কাঁধে খাটিয়াসুদ্ধ মানুষটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্চে। লোকটা বালিশে মাথা দিয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে আছে অচৈতন্যভাবে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কুলিদের—কে এ বাবু?

—বি. টি. টি. কোম্পানীর লোক।

—কি হয়েছে ?

—বেমার।

—কোত্থেকে আসচে ?

—জঙ্গলের মধ্যে কাজ করছিল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্চ ?

—পোংসা। সেখান থেকে মনোহরপুর হাঁসপাতালে।

—বাঙালী ?

—হাঁ বাবুজি।

—নাম জানো ?

—চক্কট্টী বাবু।

বড় ইচ্ছে হোল এই রোগগ্রস্ত প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোককে নিজে একবার দেখি, দুটো কথা ওঁর সঙ্গে বলি। কিন্তু তিনিও জ্বরে বেহুস, আমারও সময় নেই।

মিঃ সিংহ বল্লেন—ভীষণ ম্যালেরিয়া মশাই, সারাণ্ডার ভেতরে।

—লোক থাকে না ?

—হো যারা, তারা ভোগে না, ভোগে বিদেশীরা।

সারাণ্ডা ফরেষ্টে পক্ষপাতিত্ব আছে বেশ!

—শুধু ম্যালেরিয়া ?

—ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার।

খাটিয়াসুদ্ধ রোগী পোংসার দিকে বাহিত হয়ে চলে গেল। আমরা আরও কিছুদূর এসে উসুরিয়া নামে একটা পার্ব্বত্য ঝর্ণা বা ক্ষুদ্র নদী পার হলুম। মিঃ সিংহ বল্লেন—আনেকদিন আগে গ্রেগরি বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাস করতো উসুরিয়া ঝর্ণার ধারে

একটা বাংলোত—আমাকে মাঝে মাঝে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতো তার বাংলোতে। চলুন সে জায়গাটি দেখে আসি।

১৯২৫ সালে গ্রেগরি ওখানে থাকতো।

উস্থুরিয়া পাহাড়ী নদী। খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্চে বনের মধ্যে দিয়ে—তুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হচ্চে উস্থুরিয়া ঝর্ণার নির্ম্মল জলধারা। অপরাহ্ণের ছায়া পড়ে এসেচে, হল্‌দে রোদ উঠেচে গগনচুম্বী তরুনিকের শীর্ষদেশে।

কতক্ষণ নদীর তীরে শিলাসনে বসে রইলুম। উস্থুরিয়ার কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত।

মিঃ সিংহ দেখে এসে বল্লেন—গ্রেগরির বাংলোর চিহ্ন নেই, সেখানে ঘোর বন।

—গ্রেগরি কি করতো এখানে?

—কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল উস্থুরিয়ার পাড়ে। সাহেব ছিল কারখানার ম্যানেজার।

—কারখানা উঠে গেল কেন?

—ঠিক জানিনে। শুধু সাহেবের বাংলো নয়, কুলিদের ব্যারাক ছিল, কারখানা ঘর ছিল। দেখচি কিছুরই চিহ্ন নেই।

—১৯২৫ সালের পর এই প্রথম এলেন ১৯৪৩ সালে?

—তাই। উনিশ বছর পরে।

—"তুরা যত্র স্রোতঃ" কালিদাসের সেই শ্লোক জানেন তো? নগরী হচ্চে বন, বন হচ্চে নগরী। কালিদাসের কালেও তা এমন ধারাই ঘটতো। আজ দেখচেন পোংসায় বি. টি. টি. কোম্পানীর আপিস, মিঃ লক্‌নার তার বড় সাহেব। তু'দিন পরে সব জঙ্গল হয়ে যাবে, বুনো হাতীর ভয়ে দিনমানে মোটর চালানো তুষ্কর হবে।

এইভাবে সেদিন আমি মিঃ সিংহের গল্পে বর্ণিত পথ নিজের চোখে দেখেছিলুম। কিন্তু আমি সারাণ্ডা ফরেষ্টের গল্প বলতে বসিনি, বলছিলাম চিটিমিটি থেকে আমাদের চাঁইবাসা ফিরবার গল্প। সেই গল্পই আবার আরম্ভ করি।

গাছতলা থেকে চা খেয়ে ও মিঃ সিংহের গল্প শুনে উঠে দেখি রাত অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। বন্যহস্তীর ভয়ে সেই পার্ব্বত্যপথে সাবধানে গাড়ী চালিয়ে আমরা বরকেলা শৈলমালা থেকে ধীরে ধীরে নেমে সমতলভূমির পথে নামলুম। সৈদবা কলি আমাদের ডানদিকে। এবার আর পথের ধারে গভীর খাদ নেই, সুতরাং নিরাপদ পথে দ্রুত ছুটলো মোটর।

মিঃ হরদয়াল সিং বল্লেন—ঐ সামনেই রাঁচি রোড—

একটু পরেই আমরা পিচ-ঢালা চওড়া রাঁচি রোডে এসে উঠলাম। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রোরো নদীর সেতু পার হয়ে চাঁইবাসা টাউনে প্রবেশ করলুম—রাত তখন দশটা—এ কথা আগেই বলেছি।

চাঁইবাসা ফিরে ঠিক করা গেল পরদিনই আমরা জয়ন্তগড় ও চম্পূয়া যাবো এবং বৈতরণী নদীর ধারে মাঠে ও বনে হবে আমাদের নিক্‌পিক্! প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে যে, যে বনভোজনে বাড়ী থেকে তৈরি খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়া হয় তার নাম হোল নিক্‌পিক্— আর যেখানে রান্না করে খাওরা হয় সেটা পিক্‌নিক্। নিক্‌পিকের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন বৌমা, সুবোধের স্ত্রী। তাঁর নিপুণ ও শিল্পীহস্তের তৈরি অনেক কিছু সুখাদ্য এলুমিনিয়ম্ সম্পুটকে ভর্ত্তি হোল, তবে চা নাকি তৈরি হবে বৈতরণী নদী-তীরের চমৎকার মাঠে ও বনের ধারে—তাই চায়ের সাজসরঞ্জাম নেওয়া হোল সঙ্গে।

আমরা জন পাঁচেক একটা মোটরে। হাট-গামারিয়ার রাস্তায় মোটর হু হু চললো। দুধারে গ্রাণাইটের অনুচ্চ পাহাড়, চাঁইবাসার আশে পাশে দক্ষিণ ধলভূমের সর্ব্বত্র এই ধরণের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় কালো পাথুরে কয়লার একটি স্তূপ। পাথরগুলোও অনেক জায়গাতেই অমনিতর ছোট ছোট ও আলগা। পাহাড়ের ওপর শিশুগাছ (Dalbergia Sishu) অনেক দেখলুম এ অঞ্চলে। শিশুগাছ সাধারণতঃ পাহাড়ে দেখা যায় না, বনে পাওয়াও কঠিন। বাংলা দেশে যা শিশুগাছ বলে চলে, তা হোল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি রেইন ট্রি। অনেক জেলা-বোর্ডের পথের ধারে বাংলাদেশে এই জাতীয় গাছ যথেষ্ট দেখা যায়।

মিঃ সিংহ বল্লেন—কাছেই একটা ভালো ঝর্ণা আছে।

—কতদূর ?

—রাস্তা থেকে এক মাইল। বনের মধ্যে।

—এখন যাওয়া যাবে ?

—ফিরবার পথে সুবিধা হবে এখন থাক।

এ পথে হাট-গামারিয়া একটি ভালো জায়গা। মহারাজ শ্রীশ নন্দীর চীনামাটির খনি আছে এখানে। আর একটা আছে কিছুদূরে, সেটার মালিক জনৈক ধনী মাড়োয়াড়ী মহাজন। ধূ ধূ মাঠ ও রুক্ষ গ্রাণাইট পাথরের অনুচ্চ টিলার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা লোকালয়, বাজার, চায়ের দোকান, খোলার চালার দোকান-ঘর, একটি ডাকবাংলো—এই নিয়ে হাট-গামারিয়া। তারপর আবার চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা সীমাহীন অনুর্ব্বর প্রান্তরের বুক চিরে সোজা চলেছে বহুদূরস্থ কেউনঝর-ষ্টেটের শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। মাঝে মাঝে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদী ঝিরঝির করে বইছে। আর একটা কি গ্রাম পড়লো, শুনলুম অনেক

সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের বাস সে গ্রামে। একটা মসজিদও দেখা গেল। বন কোথাও নেই—দু একটা শাল মহুয়া গাছ মাঠের মাঝে মাঝে।

অনেক দূর গিয়ে সামনে পড়ল একটা বড় নদী, তার ওপর বাঁদিকে একটা ভাঙ্গা পুল। রাস্তা বেঁকে চলে গেল নদী পার হয়ে একটা নতুন-তৈরি পুলের ওপর দিয়ে। নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল গাড়ী। সুবোধবাবু বল্লেন—বৈতরণী পার হলেন এবার।

—বলেন কি? এত সহজে?

—তাই।

—এখন কোথায় যেতে হবে?

—তিন মাইল দূরে চম্পুয়াতে যাবো।

—সে তো কেউনঝর রাজ্যে!

—বৈতরণী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেউনঝর রাজ্যে পা দিয়েছেন।

—সীমান্ত রক্ষী টক্ষী নেই?

—ও সবের বালাই নেই এদিকে?

আমরা একটি দৃশ্য দেখলুম—কেউনঝর-ষ্টেট থেকে লুকিয়ে চাল এনে বিক্রি করছে গরীব চাষীরা। বৈতরণীর এপারের ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম গ্রামে গাছতলায় চোরাই চালের হাট। খরিদ বিক্রি বেশ জোরে চলছে। ক্রেতা বেশির ভাগ মাড়োয়াড়ী মহাজন।

দূরে মাঠের মধ্যে বেশ সুন্দর একটি অট্টালিকা দেখা গেল।

মিঃ সিংহ বল্লেন—ওই হোল চম্পুয়া ফরেষ্টার্স ট্রেনিং একাডেমি।

—কেউনঝর-ষ্টেটের?

—আমাদের গভর্ণমেণ্টের।

স্কুলটা আমরা দেখতে গেলুম। সাহাবাদ জেলার একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তিনি অত্যন্ত যত্ন করে মেয়েদের

নিয়ে ক্লাশরুম, মিউজিয়ম, বোর্ডিংঘর ইত্যাদি দেখালেন। বড় বড় ব্ল্যাক্‌বোর্ড টাঙ্গানো ক্লাশে ক্লাশে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। নূতন পালিশ করা 'চেয়ার বেঞ্চ'। বেশ ভালো ব্যবস্থা পড়াশুনোর।

মিউজিয়ম, সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বনের বিভিন্ন শ্রেণীর টিম্বার, লতা, বীজ, বনজাত দ্রব্যাদি দিয়ে সাজানো। এখানে প্রথম গিলে বীজ দেখলুম—গিলের সাহায্যে ধুতি পাঞ্জাবি কোঁচাতে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা কি জানতাম না। মহিষের শিং-এর মত প্রকাণ্ড এক প্রকার ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে তাই হোল গিলে। একটা ফলের মধ্যে আটটা করে বীজ থাকে। নানা রকমের আঁশ যা থেকে নাকি রেশমের চেয়েও ভাল কাপড় হতে পারে, তবে হয় না। মিউজিয়মের বাহিরে ওসব আর কোথাও দেখা যায় না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বল্লেন—আপনাদের একটু চা—

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বল্লাম—না না থাক, তার আর দরকার নেই। বেলা গিয়েছে।

একটু পরে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চল্লাম জয়ন্তগড়। বৈতরণী-তীরে সুন্দর ডাকবাংলো ও মাঠ। বৈতরণীর একটা ছোট খাল, ডাকবাংলোর মাঠের এক ধার বেষ্টন করে রেখেচে। খালে এখন জল নেই। খালের ধারে জলজ ঘাস। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও মনোরম।

সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, ওরা ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলো মাঠে। মেয়েরা চায়ের জল চড়াবার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। নিক্‌পিকের আয়োজন পুরোদমে চললো।

আমরা তিনটি পুরুষ-মানুষ নদীর ধার ঘেঁষে চেয়ার পেতে বসে যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্চ্চা করি। একটি ছেলে এসে বল্লে—মা বলে দিলে কাঠ নেই—

আমি অবাক হয়ে বলি—কাঠ ?

—হুঁ !

মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলি—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে ?

মিঃ সিংহ সুবোধের দিকে চেয়ে বল্লেন—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে ?

সুবোধ ছেলেটির দিকে চেয়ে কড়া সুরে হেঁকে বল্লে—কাঠ নেই বলে দিগে যা—

আমি বল্লাম—তা হোলে চা-ও থাকবে পড়ে। মেয়েরা কাঠ যোগাড় করবে কোত্থেকে ?

একটু পরে ছেলেটি আবার ফিরে এসে বল্লে—মা বল্লে কাঠ না পেলে চা হবে না।

আমি সংক্ষেপে বল্লাম—খুব লজিক্যাল কথা।

সুবোধ চটে উঠে বল্লে—তবে ব্যবস্থা করুন।

—সবাই মিলে কাঠ কুড়ুতে যাই চলুন।

মিঃ সিংহ বল্লেন—খুব ন্যায্য কথা !

সুবোধ নিরুপায় হয়ে বল্লে—ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিই কাঠ আনতে।

আমি বলি—অভাবে শুকনো খড়।

চমৎকার নিক্‌পিক্ ঘটে গেল জয়ন্তগড়ের ডাকবাংলোর সামনের মাঠে বৈতরণীর তীরে। প্রচুর জলখাবার তার সঙ্গে গরম চা। শীত পড়েছিল, আমরা বেলা সাড়ে চারটের সময় মোটরে উঠলুম আবার। বেশি দেরি করা উচিত হবে না। মাইল সাতেক গিয়ে একটা চীনে-মাটির খনি। ধনী মালিকের প্রাসাদোপম বাসগৃহ কারখানা ও আপিস ঘরের হাতায়। আমরা গিয়েছি শুনে ম্যানেজার নিজে এসে

কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। এই মাটি দিয়ে চায়ের ডিস্ পেয়ালা তৈরির পরীক্ষা চলছে সেখানে।

আমি বল্লাম—মালিক কোথায় থাকেন ?

—ওঁর দেশ গোয়ালিয়র, তবে চাঁইবাসাতে বাড়ী আছে।

—ভাল কাজ চলছে ?

—কাজ দশগুণ বেড়ে গিয়েছে যুদ্ধের দরুন। গভর্ণমেণ্ট থেকে বহু চায়ের ডিস্ পেয়ালার অর্ডার পেয়েছি।

—ডিস্ পেয়ালা হচ্ছে ভালো ?

—পরীক্ষা চলছে, এখন যা হচ্ছে তা ভেঙ্গে যায় সহজে।

—এ মাটিতে টেকসই হবে ?

—নিশ্চয়ই। মাস দুইয়ের মধ্যে আমরা গভর্ণমেণ্টের অর্ডারে হাত দিতে পারবো।

তাঁর অনুরোধে আমরা মালিকের প্রাসাদের ছাদে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্চে দূরে গুহা আর নোয়ামুণ্ডি পাহাড় জঙ্গলের পেছনে। পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভ আকাশপটে এই নীল অরণ্যানীর দৃশ্য যেন ছবির মত আঁকা। সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধনী মালিকের শ্বেত প্রাসাদটি যেন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। যেখানে আশেপাশে বহুদূরের মধ্যে শুধু গ্রাণাইট পাথরের গণ্ডশৈল ও মুণ্ডারি অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির।

আমরা বল্লাম—এ বাড়ীতে মালিক থাকেন কখন ?

ম্যানেজার হেসে বল্লেন— যখন তাঁর মর্জি হয়। বাড়ী তৈরি শেষ হয়েছে অল্পদিন।

—এর মধ্যে আসেন নি ?

—না। তবে দেখতে আসবেন জানিয়েছেন।

—কত টাকা খরচ হোল বাড়ীতে ?

—চল্লিশ হাজারের ওপর খরচ হয়ে গিয়েছে।

ম্যানেজার আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে চাইলেন—কিন্তু আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হাট-গামারিয়া চীনেমাটির খনিতে পরেশ সান্ন্যাল কাজ করেন। তিনি অনুবাদ-সাহিত্যে হাত পাকিয়েছেন। আমাদের ইচ্ছে হোল ঘোরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাট-গামারিয়া এসে ডাকবাংলোর পেছনে এসে বাসা খুঁজে বার করা গেল। কিন্তু একটি ছোট মেয়ে ভেতর থেকে এসে জানালো, কাকা তো বাড়ীতে নেই—বাজারের দিকে গিয়েছেন। বাজারে এসে খোঁজাখুঁজি করতে পরেশবাবুর দেখা পাওয়া গেল। সেই তেপান্তর মাঠের মধ্যেকার ক্ষুদ্র গ্রামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকেন এঁরা, অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি বাঙালীর মুখ দেখে পরেশবাবু খুব খুসী হয়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে আমরা ফিরে এসেচি এতে খুব দুঃখিত হোলেন। বল্লেন—চলুন, একটু চা খেয়ে আসতে হবে। আমরা বল্লাম, আজ রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। আর একদিন নিশ্চয়ই হবে।

সুবোধবাবু বল্লেন—আপনি কাল আসুন না চাঁইবাসায়।

—যাবো।

—আপনি এলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাবো।

আমরা বিদায় নিলাম পরেশবাবুর কাছ থেকে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না !

বার বার আমরা মনে হচ্ছে বনের সেই অদেখা ঝর্ণাটির কথা। যদি এতরাত্রে এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে যাওয়া যেত। কিন্তু কোনো

কথা বলতে ভরসা হোল না, রাত প্রায় দশটা বাজে। সুবোধবাবু বল্লেন—কাল সেরাইকেলা যাওয়া যাবে যদি পরেশবাবু আসেন—

মিঃ সিংহ বল্লেন—এবার কিন্তু আর নিক্‌পিক্ নয়, পুরো পিক্‌নিক্‌ই হোক—

—অসুবিধে আছে। ওসব হাঙ্গামা পোষাবে না। নেমন্তন্ন, মানে পার্টি আছে সেখানে—

আমরা বিনা নিমন্ত্রণে পার্টিতে যাই করে ?

তাতে কিছু আটকাবে না। এ সব নিজেদের মধ্যের ব্যাপার।

পরদিন আমরা বেশ একটা বড় দল সেরাইকেলার পথে রওনা হলাম। ও পথে মাইল পাঁচেক যাবার পরে মুক্ত প্রান্তরের এখানে ওখানে অসংখ্য গণ্ডশৈল আমাদের চোখে পড়লো। আরিজোনার 'পেইণ্টেড ডেজার্ট' ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। কি অদ্ভুত ছন্নছাড়া মুক্তরূপা প্রকৃতি! ধরণীর অরুণোদয় এখানে বাধাবন্ধহীন, নিজের মহিমাতে নিজে ভরপূর। ঘরদোরের পাঁচিল দেওয়াল এরা একমুহূর্ত্তে ভেঙে দিয়ে মনটাকে গৃহবিবাগী, উদাস বাউল করে তোলে। কোনো পাহাড়ের ওপর কোনো গাছ নেই—শুধু কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তূপ, কোনো কোনোটাতে সামান্য একটু ঘাস। দূরে পশ্চিম দিগন্তে সুদীর্ঘ বরকেলা শৈলমালা, দূরত্বের কুয়াসাতে কিছু অস্পষ্ট। ওরই ওপরে কোথাও সেই চিটিমিটি-বাংলো। ওরই সানুদেশের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে সেদিন মোটরে চড়ে নেমে আসা।

একটা কি নদী পার হোল গাড়ী। নদীর জলে এখানে ওখানে ডুবে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। সামনে একটা অপকৃষ্ট খোলার বস্তি নজরে পড়লো। নীচু খোলার বস্তির একপাশে একটা সাদা চুণকাম করা অট্টালিকা।

আমি বল্লাম—ওটা কি ?

সুবোধ বল্লে—ওই সেরাইকেলা।

সেরাইকেলা ক্ষুদ্র টাউন। ঢুকতেই কতকগুলি খোলার বস্তি, মাঝে মাঝে দু' চারটি চুণকাম করা সাদা একতলা দোতলা বাড়ী। বাজারে অনেক দালান পসার, তবে সবাই যেন খুব গরীব লোক, কাঠের কারিগরেরা বারকোষ খেলনা ইত্যাদি তৈরি করচে, ছোট ছোট খোলার ঘরে বসে। বাজারের ভেতরটা বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেও আমার মনে হোল না।

ঢুকেই যেখানে গেলাম, সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, টাউনে বেজায় কলেরা দেখা দিয়েচে। আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তবে এখানে আমাদের কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

পি. ডবলিউ. ডি. আপিসে বসে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। একটি বাঙালী যুবক-কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। তিনি সুলেখক মাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি আত্মীয় হন। আমি মাণিকবাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম তাঁকে ; শুনলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আওরঙ্গবাদে (গয়া জেলার মহকুমা) শিক্ষকতা করেন এবং বর্ত্তমানে সেইখানেই আছেন।

একটু পরে চা লুচি ও সন্দেশ আসতে আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম।

—এসব—

—কোনো ভয় নেই, সব বাড়ীর তৈরি।

—কিন্তু জলটা—

—ও এই বাংলোর হাতার ইঁদারার। তাও ফুটিয়ে নেওয়া।

—তাই তো—

—কোনো ভয় নেই। দোকানের কোনো জিনিস নেই।

জলযোগ সেরে আমরা রাজবাড়ী দেখতে গেলাম। এমন খুব বড় বাড়ী নয়, বাংলাদেশের গ্রাম্য জমিদার-বাড়ীর মত সাদাসিদে, আড়ম্বরশূন্য। আমরা দরবার-হলে নীত হলাম। এই হলের দেওয়ালে চারিদিকে রাজপরিবারের ব্যক্তিগণের বড় ছোট তৈলচিত্র, একপ্রান্তে থিয়েটারের ষ্টেজ। এই সেরাইকেলার রাজপরিবার নৃত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, এরা অনেকে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মহাত্মা গান্ধীর সামনে এম্পায়ার থিয়েটারে যে চৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তার একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখলাম এখানে। পাতিয়ালার রাজবংশের সঙ্গে সেরাই-কেলার রাজবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ বিখ্যাত ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন আমি, পরিমল গোস্বামী, 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদক কিরণবাবু ও বন্ধুবর প্রমোদ দাসগুপ্ত যাচ্ছিলাম সম্বলপুর জেলার দুর্গম পর্ব্বতারণ্যের অভ্যন্তরে বিক্রমসোল নামক স্থানের অজানা শিলালিপির সন্ধানে। সিনি জংসনে আমরা এই বিয়ের জন-সমাগম ও শোভাযাত্রা দেখি। সে হোল ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসের কথা।

রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা স্থানীয় মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এটি বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সব খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই মিউজিয়ম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার বাবু হরিদাস মহান্তি আমাদের সে সব দ্রব্য বিশেষ করে দেখালেন। খনিজ এ্যাসবেষ্টোস্ এখানে প্রথম দেখলুম একটা কাচের আলমারির মধ্যে।

বল্লুম—এটা কি জিনিস? কিসের সুতো?

কারণ একগোছা সরু রৌপ্যসূত্রের মত দেখতে জিনিসটা।

হরিদাসবাবু বল্লেন—ও হোল এ্যাসবেষ্টোস্। খনি থেকে ওঠানো অবস্থায়।

আরও নানা ধাতু দেখলাম বিভিন্ন কাচের আলমারিতে।

বিকেলের দিকে আমরা সেরাইকেলা থেকে বার হই।

আমাদের গাড়ীতে এক হাঁড়ি খাবার তুলে দিলেন এঁরা।

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলুম আসবার সময় পথের ধারে যে সব শৈলমালা দেখে এসেচি, ওদের মধ্যে কোনোটার ওপর বসে নিক্‌পিক্—কিংবা—

নিক্‌পিক্‌ই হয়ে গেল ঠিক।

আমাদের মধ্যে তর্ক বাধলো। কেউ বলে, "এই পাহাড়টা ভালো—" কেউ বলে, "ওটা ভালো"।

অবশেষে বন্ধুবর পরেশ সান্ন্যাল একটি পাহাড় দেখিয়ে বল্লেন,—"দেখুন এটাই সব চেয়ে ভাল হবে।"

বড় সুন্দর পাহাড়টি, বড় চমৎকার সেই বিস্তৃত প্রান্তর—ঠিক যেন ফিল্মে দেখা আরিজোনার সেই 'পেইণ্টেড্ ডেজার্ট'।

তখন বেলা পড়ে এসেচে। আমরা অনুচ্চ পাহাড়টিতে উঠলাম, ওর সমতল শিখরদেশে আমরা সতরঞ্চি পেতে বসলাম। আমাদের চারিদিকে অনুচ্চ, রুক্ষ, অনুর্ব্বর অসংখ্য পাহাড়—নানা আকৃতির, নানা ধরণের। কোনোটার আকার পিরামিডের মত, কোনোটার বা মন্দিরের মত, কোনোটা নর্ম্মান কাস্‌ল-এর মত, কোনোটা বিরাটকায় শিব-লিঙ্গের মত, কোনোটা গম্বুজাকৃতি। কোনোটার রং কালো, কোনোটা মেটে সিঁদুরের মত রাঙা, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঝক্‌ঝকে মিছরির মত সাদা কোয়ার্জ্জ্ পাথরের। প্রত্যাসন্ন শীতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ কোনো কোনোটার মাথায়। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে খড়কাই নদীর দিক থেকে। পশ্চিমে বহুদূরে দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে সুদীর্ঘ বরকেলা পাহাড়শ্রেণী, তারই পেছনে এখন টক্‌টকে রাঙা

সূর্য্যটা অস্ত যাচ্চে। চারিপাশের সেই সব অদ্ভুত-দর্শন পাহাড় দেখে মনে হয় আমেরিকার কোনো ছন্নছাড়া মরুভূমির মধ্যে যেন বসে space-এর সমুদ্রে ডুবে আছি, থৈ থৈ space-এর সমুদ্র, কূলকিনারা দেখা যায় না।

মনে হয় কলকাতার সরু এঁদো গলির মধ্যে আলোবাতাসশূন্য একতলা ঘরে যারা বাস করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যারা সূর্য্যাস্ত দেখবার সুযোগ পায় না, মুক্তরূপা ধরণীর সৌন্দর্য্য, প্রসারতা, অপরাহ্নের ছায়া-নেমে-আসা বিরাট প্রান্তরের ছবি যারা কখনো দেখেনি, নির্জ্জন পাহাড়ের সমতল শিলাসনে বসে দূরের গিরিমালার দিকে চেয়ে থাকেনি কখনো যারা, তাদের নিয়ে আসি, তাদের সব দেখাই। এখন অনেক গরীব গৃহস্থের কথা আমার মনে হয় এই সব মুক্ত স্থানে বসলেই। আমি জানি তাদের, কি ভাবে তারা থাকে।

ওদেরই মধ্যে একটি বধূ আমাকে বলেছিল—দাদা, তারকেশ্বর কোন দিকে?

—কেন?

—সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে—

—গেলেই হয়। বেশি দূর তো নয়।

—তাই তো দাদা, পয়সায় যে কুলোয় না! উনি যা পান তাতে এই ঘরভাড়া দিয়ে খেয়ে দেয়ে কি থাকে বলুন। কতদিন থেকে ভাবচি—

এই বাসায় কতদিন আছ তোমরা?

—হয়ে গেল সাত বছর। আমার ঐ খুকির বয়েস, দাদা।

—কোথাও যাওনি এই সাত বছরের মধ্যে?

—হ্যাঁ, যাচ্চি—কোথায় যাবো ? আপনি পাগল ! পয়সা কোথায় ?

যখন কোথাও যাই, কোনো ভাল জিনিস দেখি, তখন আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই বধূটির কথা মনে পড়ে।

পরেশবাবু একটা গল্প জুড়ে দিলেন। আমরা খাবারের হাঁড়ি খুলে শালপাতায় খাবার ভাগ করে দিতে থাকি। তারপর সবাই খাই, আর চারিদিকে চাই।

এ ঠিক আরিজোনার মরুভূমি, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখুনি দূরে কোথাও কোয়োট্ ডেকে উঠবে, যার ছন্নছাড়া চীৎকার শুনলে নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে অতি বড় সাহসী পথিকেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

সেই পাহাড়টিতে আমরা বসে রইলুম সন্ধ্যার একপ্রহর পর পর্য্যন্ত। হাসি গল্পে সময় কাটলো।

মোটরে চাঁইবাসা ফিরবার পথে আমরা জল্পনা-কল্পনা করলাম, একটা জ্যোৎস্না রাত দেখে শীগ্‌গির আবার একদিন ঐ পাহাড়টাতে এসে পিক্‌নিক্ করতে হবে। বড় সুন্দর প্রান্তর, বড় সুন্দর পাহাড়টি। এ ধরণের জল্পনা অনেকক্ষেত্রে অনেক বার হয়, কিন্তু আর কার্য্যে পরিণত হয় না। কোনো ভাল জায়গায় বেড়িয়ে ফিরবার পথে মনে হয়—ও, এই তো। এখানে আবার কতবার আসবো, এই এতো কাছে !

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। যাওয়া আর ঘটে না।

এখানেও তাই। সেরাইকেলা ভ্রমণের পরে তু' বছর কেটে গিয়েছে —অথচ সেই নির্জ্জন শৈল সন্দর্শনের সৌভাগ্য আর কখনো ঘটেনি আমাদের।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচীর পথে বিখ্যাত হিড্‌নি জলপ্রপাত। অনেকদিন থেকে আমাদের দেখবার ইচ্ছে ছিল। গত বৎসর ভাদ্র

মাসে (১৩৫০ সালের ভাদ্র) আমি ঘাটশিলা থেকে সাহিত্যসভা উপলক্ষে চাঁইবাসা যাই। সভা শেষ হোল রাত দশটায়।

গুমট্ গরম। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী আহারাদি সেরে অনেক রাত পর্য্যন্ত কোলহান পার্কের বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করলাম। কোলহান পার্ক চাঁইবাসা টাউনের একটা সম্পদ বলে মনে করি। মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ধারে ফুলের বাগান, হু হু করচে জলের হাওয়া, ভুর ভুর করচে হাস্‌নুহানার সুবাস বাতাস, ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্না, নির্ম্মেঘ আকাশ। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আবৃত্তি করচেন, কেউ গান করচেন, রাত যে কত হয়েচে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ বন্ধুবর সুবোধ ঘোষ বল্লেন—চলুন, শোওয়া যাক গে, রাত বোধ হয় বারোটা একটা হয়ে গেল—

বাস্তবিক সে একটা অদ্ভুত রাত্রি কাটিয়েচি কোলহান পার্কের জলের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে। পাঁচ ছ'জন বন্ধুবান্ধব, সবাই মিলে গানে গল্পে কোন দিক থেকে সময় কেটে গেল, ঘুমোবার ইচ্ছে নেই কারো।

এই সময় মিঃ সিন্‌হা বাড়ী থেকে ঘড়ি দেখে এসে বল্লেন—রাত তিনটে—

আমরা সবাই চমকে উঠি।

—তি-ন-টে ?

—খাঁটি তিনটে। এক মিনিট কম নয়!

—তাইত!

সুবোধ প্রস্তাব করলে—তবে আর শুয়ে কি হবে ?

আমিও এতে সায় দিলাম।

পরেশবাবু বল্লেন—আমারও তাই মত।

আমি বল্লাম—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

সবাই বল্লে—কি ?

—এখুনি চলুন সবাই বেরুনো যাক একসঙ্গে। কাল সকালে হিড্‌নি ফল্‌সে নিক্‌পিক্‌ করা যাক—

সবাই মিলে হৈ হৈ করে উঠলো। বেশ ভালো প্রস্তাব। পরেশ-বাবু বল্লেন—আমারও অনেকদিন ওটা দেখার ইচ্ছে ছিল—তাই চলুন। সুবোধ মোটর বার করতে চলে গেল। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী গিয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে ছেঁদে নিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী ঘন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত হিড্‌নি জলপ্রপাতের কাছে বনভোজন করবার সব আয়োজন ঠিক করে মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি কেবল বল্লেন—আমার আজ যাওয়া হবে না। ঘাটশিলায় ফিরতে হবে, আমাকে দয়া করে চক্রধরপুরে বম্বে-মেল ধরিয়ে দেবেন—

এখন রাত চারটে। চক্রধরপুর মাইল ষোলো আঠারো রাস্তা। আমরা জ্যোৎস্নালোকিত রাঁচি-রোড দিয়ে রোরো নদীর পুল পার হয়ে সবেগে মোটর ছুটিয়ে দিয়েচি। দুধারে ছোট বড় পাহাড়, বর্ষায় বনানী সবুজ হয়ে উঠেচে, জ্যোৎস্না পড়েচে পাহাড়ী নদীর জলে, মাঝে মাঝে দু-একটা হো-অধিবাসীদের বন্যগ্রাম। পরেশবাবু প্রকৃতিরসিক ব্যক্তি। বল্লেন—এদিকে কখনো আসিনি—ভারি চমৎকার তো ? কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে।

সুবোধ বল্লে—আরও আগে চলুন, আরও ভাল দেখবেন—

একটু পরে সঞ্জয়-নদীর পুল পার হয়ে আমরা দূরে চক্রধরপুরের সাদা সাদা বাড়ী দেখতে পেলাম। ঘাটশিলার বন্ধুটি তাড়াতাড়ি

করতে লাগলেন, পাঁচটা বাজবার দেরি নেই, বম্বে-মেল পাওয়া যাবে তো?

চক্রধরপুর ষ্টেশনের বাইরে আমরা মোটর থামালুম, বন্ধুটি নেমে গেলেন।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—একটু দুধের যোগাড় করলে হোত। সকাল হোলেই তো চা চাই। দুধ নেই সঙ্গে।

সুবোধ বল্লে—শেষ রাত্রে এখানে দুধ পাওয়া যাবে বলে মনে তো হয় না। চেষ্টা করতে পারেন।

কিন্তু সুবোধের কথাই ঠিক হোলো। কোথাও দুধ মিললো না চক্রধরপুর ষ্টেশনে।

আমরা মোটর ছাড়লাম। আরও আধঘণ্টা পরে আমরা দূরে টেবো পাহাড়শ্রেণী দেখতে পেলাম। কেউ কেউ এটাকে সেরাইকেলা পাহাড়শ্রেণীও বলে।

পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে রাঁচি-রোড উঠেচে ওপরে। পাহাড়ে উঠবার কিছু আগে রাস্তার ধারে ইংরিজিতে লেখা আছে 'এখান থেকে ঘাট আরম্ভ'—পাহাড়ী রাস্তাকে এদেশের ভাষায় "ঘাট" বলে।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি এসব দিকে আসিনি। আমাদের এক গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোক চক্রধরপুরে কি কাজ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম চক্রধরপুরে রাঁচি-রোডের দৃশ্য অপূর্ব্ব, বিশেষ করে রাস্তা যখন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর ওঠে। মনে আছে, আমি তাঁকে এ পথের দৃশ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তত বর্ণনা দিতে পারেন নি, মোটামুটি বলেছিলেন, 'ভালো'।

কিন্তু শুধু 'ভালো' বা 'চমৎকার' শুনে আমার মন তৃপ্ত হয়নি, আমি চেয়েছিলাম যা, তিনি তা আমায় দিতে পারেন নি।

সে আজ অন্ততঃ সতেরো আঠারো বছর আগের কথা।

তখন জানতাম না, একদিন শরৎকালের শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মোটরে সেই অরণ্য পর্ব্বতের পথে প্রমোদ ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে ঘটবে। সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো এতদিন পরে। তিনিই প্রথমে এ রাস্তার সৌন্দর্য্যের কথা আমায় বলেন, এ পথ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। যতদূর জানি, তিনি এখন আর ইহলোকে নেই, শেষ বয়সে বিদেশে কোথায় কণ্ট্রাক্টারি করতেন, সেখানে মারা যান।

তিনি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেননি দেখলুম। পথ ঘুরে ঘুরে যখন উঠতে লাগলো টেবো পাহাড়ে, তখন মনে হোলো, এ পথে সবারই একবার বেড়িয়ে যাওয়া উচিত। অপূর্ব্ব দৃশ্য। পথের দুধারে বড় বড় গাছপালা, বড় বড় পাথর, মায়াময় শিখরদেশ জ্যোৎস্নামাখা, বনের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে।

প্রকৃতিরসিক পরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বল্লেন—চমৎকার!

আমরা সকলেই এক বাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলাম।

পাহাড়ের ওপরে রাস্তার দু'ধারে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির কি অপূর্ব্ব শোভা। কেঁদ গাছের কালো কালো পাতায় জ্যোৎস্না পড়ে চক্‌চক্ করচে। ঘন, নির্জ্জন বনানীর নৈশ নিস্তব্ধতা মনে ভয় মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করে।

আমি বল্লাম—এখানে মোটর থামিয়ে একটু বনটা দেখা যাক—

সুবোধ আপত্তি করলো—এখানে বাঘের ভয়, বিশেষ করে এই রাতের বেলায়। মোটর থামিয়ে নামা উচিত হবে না।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—কিছু হবে না। নামা যাক।

পরেশবাবুও আমাদের মতেই মত দিলেন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত মোটর থামানো হোল—আমি, পরেশবাবু ও মিঃ সিন্‌হা নেমে রাস্তার ধারে বনের প্রান্তে একখানা বড় পাথরের ওপর বসলাম। সুবোধ গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

সে নৈশপ্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিস। লোকালয় থেকে বহুদূরে পাহাড়ের মাথায় ঘন বন, শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় আমরা ক'টি প্রাণী সেখানে চুপ করে বসে আছি, যে কোনো মুহূর্ত্তে বাঘ বা যে কোনো বন্যজন্তু বেরুতে পারে, বন্যহস্তীর তো কথাই নেই—এসব বনে হাতীর সংখ্যাই বেশি, ভালুকও যথেষ্ট। বিপদের মধ্যেই ভ্রমণের আসল আনন্দ, অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে, সে জায়গা যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন, বেড়িয়ে সে ভয়, সে উত্তেজনার সন্ধান মেলে না। অনুভূতির নতুনত্বই মানুষের জীবনের বড় সম্পদ। মিনিট পনেরো পরে আমরা মোটরের কাছে গিয়ে সুবোধকে ঘুম থেকে ওঠালুম। এতক্ষণ সুবোধই চালাচ্ছিল, মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—তোমার হাতে আর বিশ্বাস নেই এই পাহাড়ী রাস্তায়, ঘুমকাতুরে চোখে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। সরো, আমার হাতে ষ্টীয়ারিং দাও—

রাত শেষ হয়ে আসচে।

সেই গভীর গিরিবনে হেমন্ত রাত্রির কুয়াসা হঠাৎ ঘনিয়ে আসতেই কেউ আর কিছু দেখতে পায় না। মিঃ সিংহ গাড়ী ভরসা করে জোরে চালাতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে কুয়াসা নেমে চারিধার ঢেকে ফেলেচে, পাহাড় দেখা যায় না, জঙ্গলের গাছপালাও খুব স্পষ্ট নয়। সামনে পিছনে সব যেন ঘষা-পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। সন্তর্পণে গাড়ী চালাতে লাগলেন মিঃ সিংহ। একটু অসাবধানে

গাড়ী চালালে পাহাড়ের ধাক্কা লেগে মোটর চুরমার হয়ে যাবার ভয়। এমন সময় পরেশবাবু চেঁচিয়ে উঠে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—ঐ-ঐ-কি ওটা, দেখুন দেখুন—সকলে চেয়ে দেখলাম কি একটা জানোয়ার মোটরের হেড্‌লাইটের আলোয় মোটরখানার সামনে ছুটে চলেছে।

সুবোধ বল্লে—হরিণ।

আমি বল্লাম—বাঘ!

পরেশবাবু বল্লেন—ভালুক!

সেটা যে জানোয়ারই হোক, রাস্তা ছেড়ে দিতে জানে না দেখা গেল। সামনে সেটা চলেচে গাড়ীর আগে আগে দৌড়ে—পাশ কাটিয়ে আমাদের পথ দেবার কোনো চেষ্টাই তার নেই। সামনে ছুটচে। আমি বল্লাম—স্পীড্ বাড়িয়ে ওটাকে চাপা দিলে কেমন হয়, মিঃ সিংহ?

মিঃ সিংহ বল্লেন—হয় ভালোই, কিন্তু গাড়ী জোরে চালাতে সাহস করিনে এই কুয়াসার মধ্যে।

প্রায় মাইল খানেক পথ গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবার পরে জানোয়ারটা হঠাৎ লাফ দিয়ে বাঁ দিকের কুয়াসাবৃত বন-মধ্যে অন্তর্হিত হোল। এর আগেও সে অনায়াসেই যেতে পারতো, কেন যে যায়নি সেই বলতে পারে।

এই সময়ে সকলেরই ভীষণ ঘুম পেয়েচে। ভোর পাঁচটা ঘড়িতে দেখা গেল। ফুটফুট করচে জ্যোৎস্না, যেন রাত দুপুর। নির্জ্জন নিস্তব্ধ কুয়াসাচ্ছন্ন বনানী আমাদের চারিদিক ঘিরে। মিঃ সিংহ একবার গাড়ী থামিয়ে রুমাল বের করে চোখ মুখ মুছে নিলেন। খুব ঘুম পেয়েচে তাঁরও।

আমি বল্লাম—গাড়ী একপাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিন মিঃ সিংহ, এ অবস্থায় গাড়ী চালানোটা—

সুবোধ বল্লে—খুব বিপজ্জনক! কিন্তু এখানে গাড়ী রাখাটা আরও বিপজ্জনক—

—কেন ?

—বাঘের ভয়।

শুনে পরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বল্লেন—তবে চলুন চলুন, যাওয়াই যাক—

আমি বল্লাম—হেসাডি ডাকবাংলো আর কতদূর ?

মিঃ সিংহ বল্লেন—বেশিদূর বোধ হয় না—কুয়াসার মধ্যে কিছু যে বুঝতেই পারচি নে—

আমি বল্লাম—তা হোক মশায়, রাখুন এখানে গাড়ী। ঘুমন্ত অবস্থায় মোটর চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে—

সুবোধ ও পরেশবাবু মহা আপত্তি তুল্লে। এখানে গাড়ী রাখা যায় না এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যানীর মধ্যে, এগিয়ে যাওয়াই ভালো। আরও মিনিট পনেরো কুয়াসার মধ্যে দিয়ে চালানোর পরে বাঁদিকে বনের মধ্যে হেসাডি ডাকবাংলো চোখে পড়লো। আমাদের গাড়ী ডাকবাংলোর হাতায় ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছনের সিটে শুয়ে আধমিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভেঙ্গেচে, তখন শুয়ে শুয়েই দেখচি সামনের পাহাড়ে রাঙা রোদ, গাছের মাথায় রাঙা রোদ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি গাড়ীর মধ্যে কেউ নেই। চোখ মুছে উঠে দেখি পরেশবাবু ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করচেন। বল্লাম—সুপ্রভাত, এঁরা কোথায় ?

—সব ঘুমুচ্চে।

—ওঠান সব, বেলা হয়েচে অনেক।

একটু পরে আমরা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের টেবিলে ভিড় করেচি, কিন্তু সেই পুরাতন সমস্যা, দুধ নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে বলা গেল। তম্বি গম্বি করা হোল—দুধ নেই। লেবু আছে, তাই দিয়ে করা যেতে পারে না চা ?

মিঃ সিংহ বল্লেন—চমৎকার হবে। তাই হোক। ইটালিতে দেখেচি লেবুর চাক্‌লা কেটে চায়ে ডুবিয়ে চাম্‌চে দিয়ে চেপে চেপে খায়। সে বেশ লাগে।

খাবারদাবারের মধ্যে দেখা গেল ছোলা—রাশিকৃত ছোলা ছাড়া আর কিছু খাবার নেই। অত ছোলা কি হবে? কে খাবে অত ছোলা?

সুবোধ বল্লে—অত ছোলা খাবে কে?

আমি বল্লাম—তাই ত! কি হবে অত ছোলা?

মিঃ সিংহ বল্লেন—না হয় কিছু থাকবে এখন। হিড্‌নি ফল্‌স্ গভীর বনের মধ্যে, সেখানে গিয়ে আমরা খাবো। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখা গেল একদানা ছোলাও অবশিষ্ট নেই, এমন কি টেবিল থেকে গড়িয়ে যেসব ছোলা মেজেতে পড়ে গিয়েছিল—শেষে দেখা গেল সবাই তাও কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছি।

সুবোধ বল্লে—আরও কিছু হোলে হোত দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম—আমারও তাই মনে হচ্ছে বটে!

আরও এক মাইল এগিয়ে গেলাম মোটরে। তারপর মোটর রেখে আমরা রাস্তার ডানদিকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলুম। চারিদিকে গভীর বন, উঁচু শৈলমালা, একটা পাহাড়ী নদী পাহাড়ী রাস্তার নীচে দিয়ে বয়ে চলেচে। সামনের দিকে বন গভীরতম।

খানিকদূর গিয়ে আমরা একটা নীচু উপত্যকার মধ্যে নামলাম, আবার সেই পাহাড়ী নদীটা উপলবিছানো পথে পার হলাম। এইবার দূর থেকে জলপতনের গর্জ্জনশব্দ শোনা গেল—আরও একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো পেঁজা তূলোর বস্তার মত জলরাশি পাহাড়ের ওপর থেকে, বনের মাথা থেকে উপচে পড়চে। আবার একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নীচে নামতেই বাঁদিকের বনের আড়ালটা সরে গেল। জলপ্রপাতটা একেবারে চোখের সামনে আমাদের।

পরেশবাবু কবি লোক, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—বাঃ, অতি চমৎকার!

আমরা সবাই সায় দিলাম। জায়গাটা যেন আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো—কোথাও এতটুকু মাটি বা বালি নেই। স্তরে স্তরে নেমে গিয়েচে পাথরের ধাপে ধাপে—যেন পুকুরের সান বাঁধানো ঘাট।

মিঃ সিংহ বল্লেন—আমরা সকলে স্নান করে নেবো চলুন ওই জলে।

পরেশবাবু বল্লেন—ম্যালেরিয়া হবে না তো নাইলে?

সুবোধ বল্লে—না, ওখানে ম্যালেরিয়া কোথায়?

আমরা বসে বসে দেখলুম কতক্ষণ।

স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখবার জিনিস! শুধু বর্ণনায় পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না। যে উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে, তার চারিপাশে ঘন বনানী, চূণাপাথরের প্রাচীর। যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ল্যাণ্টানা ক্যামেরা ফুলের গাছ—ফুল ফুটে আছে।

তারপর আমরা জলপ্রপাতের তলায় স্নান করতে গেলাম!

সে এক চমৎকার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা!

প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হবে অত জল আর অত জোরে যদি গায়ে এসে পড়ে, তবে পিঠ দুমড়ে বেঁকে যাবে। তা অবিশ্যি হয় না কিন্তু এটা মনে হয় যে খুব ভারী কি একটা জিনিস হুড়দাড় করে পিঠে পড়চে। মিঃ সিংহ আবার আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন প্রপাতের ধারার পেছনে, পতনশীল জলধারা আর পর্ব্বতের প্রাচীর—এ দুয়ের মাঝখানে।

বল্লাম—কেন?

—আসুন, আসুন, মজা হবে।

—আমার মজায় কাজ নেই মশায়, ওখানে যাবো না।

—একটুখানি এসে দেখে যান—

আমিও যাবো না, মিঃ সিংহও নাছোড়বান্দা।

কিন্তু সেখানে যাওয়া সোজা কথা নয়। প্রপাতের সেই বিরাট জলের ভলুম এড়িয়ে পার হয়ে। মারা যাবো।

দৃঢ়ভাবে বল্লাম—আপনি যান। আমাকে মাপ করুন।

মিঃ সিংহ সত্যিই গেলেন সেখানে। পতনশীল সেই বিশাল জলধারার ধোঁয়ার আড়ালে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুনরায় তিনি না বার হয়ে আসা পর্য্যন্ত সত্যিই অস্বস্তিবোধ করা যাচ্ছিল।

স্নান সেরে আমরা রওনা হবো, কারণ সঙ্গে খাবার নেই, খেতে হবে সেই চাঁইবাসায় ফিরে। একজন বন্যলোক হঠাৎ সেখানে এসে পড়লো—হো-ভাষায় তাকে প্রশ্ন করলেন মিঃ সিংহ, সে যা বল্লে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

মিঃ সিংহ। কি করবি এখানে ?

সে। কেন ?

মিঃ সিংহ। বল না।

সে। মাছ।

মিঃ সিংহ। মাছ ধরবি ?

সে। হাঁ।

মিঃ সিংহ। নাম কি ?

সে নিরুত্তর।

—নাম কি ?

একপ্রকার অস্পষ্ট ঘড়্ ঘড়্ শব্দ।

মিঃ সিংহের কথোপকথন শেষ।

লোকটার হাতে বন্য ডালপালার তৈরি একরকম ছোট খাঁচার মত ব্যাপার। তাই হোল সম্ভবতঃ তার মাছ ধরবার যন্ত্র। কিন্তু এ জল-প্রপাতের উচ্ছল জলধারার মধ্যে মাছ কোথা থেকে আসবে তা আমরা বুঝতে পারলাম না কি মাছ এখানে পাওয়া যাবে তাও জানি না।

পরেশবাবু আমাদের পেছনে শিলাসনে বসে মনের আনন্দে গান ধরেচেন। সুবোধ মহা ব্যস্ত সর্ব্বদাই, সে ইতিমধ্যে কখন মোটরে গিয়ে বসেচে, আমরা তা জানিনে, দেখিনি তার চলে যাওয়া পরেশবাবুই প্রথমে বল্লেন—সুবোধবাবু কোথায় ?

আমি বল্লাম—তা কি জানি, এই তো এখানে বসেছিল।

আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে থাকি। এই ছিল, গেল কোথায়। বাঘে নিয়ে গেল নাকি ! জায়গাটা তো ভাল নয়।

মিঃ সিংহ বল্লেন—না না, সে মহা ব্যস্তবাগীশ, সে চলে গিয়েচে গাড়ীতে ফিরে। গাড়ীতে বসে আছে রাঁচি-রোডে।

তখন আমরা সবাই মিলে ফিরলাম।

আর দেরী করা উচিত নয়। লোকটাকেও দেখা উচিত, খিদেও পেয়েচে যথেষ্ট।

এবার অন্য একটা পথ ধরে রাঁচি-রোড ফিরি। আগে সুবোধ যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে এটা যে কত ভাল !

এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া সর্ব্বত্র। এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। সারাপথ যেন ঋষিদের পবিত্র তপোবন। জনমানবশূন্য। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাচি-রোডে এসে মোটরে চড়লাম। হু হু করে মোটর ছুটলো কাল রাত্রিকার দৃষ্ট সেই টেবো অরণ্যভূমি ভেদ করে। কাল দেখেছিলুম শেষ রাত্রের মায়াময়

জ্যোৎস্নায়, আজ দেখেছি দুপুরের খর রোদে। রাস্তার পাশে ২০০০ ফুট উঁচু টেবো পাহাড়ের ওপর টেবো বাংলো।

কেমন সুন্দর নির্জ্জন স্থানে বাংলোটি! দেখে বাস করবার লোভ হয়। চারিধারে বনশ্রেণী, উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাংলো। শিউলি ফুল ফুটে আছে।

সুবোধকে বল্লাম—একটা প্রস্তাব করি—

—কি?

—এই টেবো পাহাড়ের ওপর লেখকদের জন্যে একটা বাংলো করান—

—তারপর?

—তারপর গবর্ণমেণ্টকে লিখুন লেখকদের সেখানে ফ্রি থাকবার ব্যবস্থা করতে—

—তারপর?

—তারপর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, তার জন্যে নামমাত্র দাম নেবে গবর্ণমেণ্ট। যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারে, তবে নিতান্ত বিনা কারণে নয়, বিশেষ কোন বই লেখবার বা চিন্তা করবার বা প্ল্যান করবার সময় যখন লোকালয় থেকে নির্জ্জনে থাকবার দরকার হবে—তবে গবর্ণমেণ্টকে লিখলেই—

—তিনি যদি কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে বাংলো দখল করেন?

—কোন পাগল এই বাঘভালুকে ভরা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে বিনা কারণে আসতে যাবে? যে আসবে সে কাজ ছাড়া আসবে না। জন মানব নেই, চায়ের দোকান নেই, খবরের কাগজ নেই, আড্ডা নেই, কে থাকবে মশাই ওখানে?

পরেশবাবু বল্লেন—যে থাকবে সে সত্যিকার লেখক জানবেন—

মিঃ সিংহ বল্লেন—অথবা ভ্যাগাবণ্ড—

আমি বল্লাম—বেশ। সে কি কাজ করচে না করচে তা তদারক করবার ব্যবস্থা না হয় থাক—

সুবোধ বল্লে—কে সেটা তদারক করবে? ডাকবাংলোর চৌকিদার অথবা রোড ওভারসিয়ার?

কেন?

—তাও কালেভদ্রে। ঐ চৌকিদারই ভরসা। লেখা হপ্তায় হপ্তায় সাবমিট করতে হবে ওর কাছে।

—রাজি। তবে একটা কথা—

—কি?

—গবর্ণমেণ্টকে এটাও লিখবেন চাঁইবাসা থেকে টেবো পাহাড় পর্য্যন্ত আসার ব্যবস্থাটা গবর্ণমেণ্ট থেকে করা হবে। এত মাইল রাস্তা আসবে কিসে একজন দরিদ্র লেখক? সব সুবিধে করে দিতে হবে গবর্ণমেণ্টকে। তার লেখা বা চিন্তার জন্যে যা কিছু দরকার।

—আর কিছু?

আমি রাগ করে বল্লাম—এ ঠাট্টার কথা নয়। আজ যদি আমাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট হতো—

—কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট তাদের দেশের লেখকদের জন্যে এমন ব্যবস্থা করে রেখেচে আমি জানতে চাই—

—আমিও বলতে চাই যে যদি না করে থাকে, তাদের করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যারা চালায়, তাদের কল্পনাশক্তি কম, নিরেট বেশির ভাগ। কবি ও লেখকদের পরামর্শ এ সম্পর্কে তারা যেন নেয়। না নিলে তা সভ্যনামের উপযুক্তই নয়। দেশের লেখকদের এ সুযোগ দেওয়া, এসব সুবিধে করে দেওয়া যে কোনো গবর্ণমেণ্টের উচিত। বেশিদিন নয়, দু' একমাস নির্জ্জনে

থাকবার পরে আবার লেখক কাজ শেষ করে চলে যাবেন। দেশের দশের কাজই তো। কেন গবর্ণমেণ্ট করবে না? করা নিশ্চয় উচিত।

বলা বাহুল্য আমার সে উপদেশ কোনো কাজে এল না। মূল্যবান উপদেশগুলো বৃথায় গেল। গাড়ী পাহাড় থেকে নামলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল অনেক্ষণ থেকেই। কিন্তু পাহাড়ের নীচে নাকটি ডাকবাংলোতে জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। চক্রধরপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে জল আনিয়ে খাওয়া গেল। চাঁইবাসায় ফেরা গেল বেলা তিনটের মধ্যে।

এই ভ্রমণের কিছুদিন পরে আমি ঘাটশিলা ফিরে আসি। একদিন সন্ধ্যায় আমার এক ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়।

সে কথাটা এখানে বলি।

এ অঞ্চলে শঙ্খচূড় বা King Cobra-র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে—একথা আমি পূর্ব্বেও শুনেছি। কিন্তু অত বনে বনে বেড়িয়েও কখনো কিছু আমার চোখে পড়েনি।

একদিন আমি রাস্তা থেকে কিছুদূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই। পাহাড়টার নাম উল্‌দাডুংরি। ওদিকের ওসব পাহাড়ে গরু চরে, লোকজন ওঠে নামে, কিন্তু দূর থেকে এ পাহাড়ের দৃশ্য দেখে আমার মনে হল এ পাহাড়টাতে কেউ ওঠে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।

ভাবলুম, পাহাড়টাতে উঠে কোনো শিলাখণ্ডে বসে সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক। সামান্য খানিকটা উঠে লক্ষ্য করলাম পাহাড়টাতে বেজায় কাঁটাবন। ওপরে আর উঠবার উপায় নেই। অনেকগুলো ঝরা শুকনো পাতা সেই কাঁটাগাছগুলো থেকে ঝরে আমার আশপাশে সর্ব্বত্র পড়ে স্তূপাকার হয়ে আছে পাথরের ওপরে। কাঁটাগাছ যে খুব বড় তা নয়, আমাদের দেশের ছোট ছোট বৈঁচি গাছের মত।

বড় চমৎকার শোভা হয়েছে পশ্চিম আকাশের সেদিকে স্বর্ণ-রেখার ওপরে পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। শাল-বনের মাথায় রাঙা সূর্য্যাস্তের আভা। হু হু হাওয়া বইছে ওদিক থেকে। নির্জ্জন জায়গা, কেউ কোনদিকে নেই।

একমনে দেখতে দেখতে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি এমন সময় ঝুপ করে কি একটা শব্দ হোল। শব্দটা একটু অদ্ভুত ধরণের। শুকনো লতাপাতার উপর ঝুপ করে যেন একটা ভারি জিনিস পড়লো। পিছন ফিরে দেখি শুকনো ঝরা পাতার রাশির ওপর একটা বড় মোটা মিশকালো সাপ। কিন্তু সাপটার মুখ আর লেজটার দিকে চোখে পড়ছে না। আমি মাত্র তার মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছি। আমি যেখানে বসে, সাপটা সেখান থেকে হাত আষ্টেক দূরে। ও-ধরণের মোটা সাপ আমি আর কখনো দেখিনি।

হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো। এই নির্জ্জন পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ভীষণদর্শন সাপের হাতে পড়লে নিজেকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাড়া যদি করে পালাতে পারবো না এই কাঁটাগাছ ঠেলে।

আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে নামতে যাবো, এমন সময় সাপটা যেন পাশের দিকে অগ্রসর হয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। এখনও ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং ও আমাকে টের পায় নি।

নামতে গিয়ে মনে হোতে লাগল পাহাড়ের প্রত্যেক ফাটলে অসংখ্য ভীষণদর্শন সাপ বাসা বেঁধেছে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেচে; ভালো কিছু দেখতেও পাচ্ছিনে। কাঁটাগাছে হাত পা ছড়ে রক্তপাত হতে লাগলো। প্রাণ ভয়ে সব অগ্রাহ্য করে কোনো রকমে নামতে লাগলাম। পথও যেন আর ফুরোয় না। ওঠবার সময় বেশ উঠেছিলাম। এখন সেই পথ দুর্গম ও কঠিন হয়ে পড়েছে।

অন্ধকারও এখন বেশ। যা হোক অতি কষ্টে এক রকম করে তো নামা গেল। ছুটতে ছুটতে শালবনের মধ্যে এসে পড়লাম। উল্‌দা-ডুংরি আর চাঁইবাসার রাস্তার মধ্যে (জায়গাটা রাশ মাইন্‌স ও চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছাকাছি) এই চারা শালবন। অদূরে পথ। গালুডির হাট থেকে কয়েকজন বুনো লোক ফিরছিল! তারা আমাকে ও ভাবে শালবনের মধ্যে হাঁটতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বল্লে—কি বাবু?

তখন তাদের খুলে বল্লাম।

ওরা বল্লে—স'ন্দেবেলা ও-পাহাড়ে কেউ যায়? দেখতে পাও না গরু চরে না ও-পাহাড়ে। যে পাহাড়ে গরু চরে না সে পাহাড়ে বিপদ আছে বুঝতে হবে।

—কি আছে ওখানে?

—ওটা শঙ্খচূড় সাপে ভরা। দিনমানেও কেউ যায় না।

—তোমরা দেখেছ?

—বাবু, এই চন্দ্ররেখা গ্রামের একজন নাপিত ওই পাহাড়ে পাকাকুল তুলে আনতে গিয়েছিল। তখন অনেক কুলগাছ ছিল ওখানে। ছুপুর বেলা। কুল পাড়তে গিয়ে ছ্যাখে মস্ত বড় তিনটে শঙ্খচূড় গাছের গুঁড়ির গায়ে জোট পাকিয়ে রয়েছে। ওকে দেখে একটা তো তেড়ে এল, ও ছুট্ দিলে। কিন্তু ছুটবে কোথায়? দেখেছেন তো কেমন কাঁটা। কাঁটা পায়ে বেধে পাথরের ওপরে পড়ে গেল। ওর পড়ার শব্দে কি রকম ভয় পেয়ে সাপটা পালিয়ে গেল তাই রক্ষে, নয়তো নাপিতের পো সেদিন জন্মের মত কুল খেতো। ওসব পাহাড়ে আর কখনো এমন সময়ে উঠবেন না।

এদিন ছাড়া আর কোনোদিন সাপ দেখিনি।

তবে একবার সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ের নীচে একটা সাপের খোলস দেখেছিলাম মস্ত বড়। সে কি জাতীয় সাপের খোলস তা আমি বলতে পারবো না। তবে সে সাধারণ সাপ নয়, এটা ঠিক। সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। আমি, অমরবাবু, তিনু ও আমার ভাগ্নে শান্ত আমরা সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ে যাই। আমাদের বাড়ী থেকে সে পাহাড় প্রায় সাত মাইল দূরে। পাহাড়ে উঠে সে পাহাড় পার হয়ে ওধারের বনাবৃত উপত্যকার ঠিক ওপরেই আমরা বসলুম, তখন বেলা তিনটে। রোদ বেড়ে চলেছে। আমাদের স্নান করার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের নীচে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। পাহাড় চুঁইয়ে সেখানে টুপ টুপ করে জল পড়ছে, অনেকটা জল সেখানে। একটা মানুষ কোনো রকমে নেমে নাইতে পারে।

শান্ত বল্লে মামা, এই ঝর্ণার কি নাম?

—না কোনো নাম নেই।

—আমার নামে এর নাম দেবেন?

—যাও, আজ থেকে এর নাম শান্ত-ঝর্ণা।

এটা অনেকটা হোল সাঁওতালদের পাহাড় যৌতুক দেওয়ার মত। মেয়ের বিয়ের সময় ওরা জামাইকে যৌতুক দেয়—যাও, ওই পাহাড়টা তোমায় দিলাম।

সে পাহাড়ে হয়তো গবর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট। জামাতা বাবাজি সেখানে যদি একখানা শুকনো ডাল ভাঙতে যান, তবে তখুনি বনের চৌকিদার তাকে চালান দেবে বেঁধে! কার পাহাড় কে দেয়!

সে যাই হোক আমি সে জলে নামতে গিয়েই চমকে উঠলাম। প্রকাণ্ড এক সাপের খোলস সেই গর্ত্তের গায়ের পাথরে জড়িয়ে।

বিরাট খোলস। আমরা কাঠি দিয়ে সেটাকে তুলে দেখি আট দশ হাত কি তার চেয়েও লম্বা খোলসটা। মোটাও তেমনি। এমনি একটা বিরাট সাপের খোলস ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে সিংভূমের সারাণ্ডা অরণ্যে রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত আমায় দেখান। খোলসটা আমি কাগজে মুড়ে বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম। বারো হাত লম্বা আর তেমনি মোটা। এ খোলসটাও ছিল একটা গুহার মধ্যে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেছিলেন—পাইথনের খোলস।

তিনু ও শান্তকে অমর করে রাখার পরে সেই বনপথে আমরা অগ্রসর হয়ে চলি।

সামনেই যে ঝর্ণা তার নাম দেওয়া গেল তিনুঝর্ণা, সাঁওতালদের বিয়ের যৌতুকরূপে পাহাড় দান করবার মত। তবে আজকাল ও দেশে ওর নাম তিনুঝর্ণাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েচে। বন-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, আমার বিশেষ বন্ধু, বলেচেন বন-বিভাগের ম্যাপ ও নক্সায় আমাদের দেওয়া এই নামটি তিনি ব্যবহার করেন। সেজন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

অতি চমৎকার বনভূমি। বসন্তের প্রারম্ভে গোলগোলি ফুল ফুটেছে বনে বনে।

সিংভূমের অরণ্যভূমির এ সুন্দর বনফুলের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বসন্তের প্রথমেই এই ফুল পাহাড়ী বনে ফুটতে আরম্ভ করে—দেখতে অনেকটা সূর্য্যমুখী ফুলের মত। তিনটি কারণে এ ফুল অতি সুন্দর দেখায়। প্রথম, নিষ্পত্র প্রকাণ্ড গাছে এ ফুল ফোটে; দ্বিতীয়, সাদা কোয়ার্জ্জ পাথরের অথবা কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে, সবুজ অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ ঠেলে ওঠে, এখানে ওখানে সাদা ডালপালাওয়ালা নিষ্পত্র গাছ; তৃতীয়,

ফুলের রং ও গড়ন অতি সুন্দর। পুকারের বিখ্যাত বই হিমালয়ান জর্ণ্যালের মধ্যে এই ফুলের উল্লেখ আছে ও ছবি আঁকা আছে।

তিনু বল্লে—দাদা, চলুন আমরা পাহাড়ে ঘুরে যাই।

পাহাড় ঘুরে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দেখি গোলগোলি গাছের মেলা। তার নীচেই ধাতুপ ফুলের বন রাঙা হয়ে আসচে নব মুকুলের আবির্ভাবে। এই আর একটি চমৎকার ফুল—মধু চুষে খাওয়া যায় বলে এ ফুল ছেলেপিলের বড় প্রিয়, আরও প্রিয়তর বন্য ভালুকের।

ভালুকের ব্যাপারও অনেকরকম শোনা গিয়েছে, এসব বনে।

আজ বছরখানেক আগে ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী এঁদেলবেড়া বনে একটি কাঠুরে লোককে ভালুকে জখম করে। লোকটা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ একটা ভালুক গাছের ডাল থেকে নেবে ওর দিকে তেড়ে আসে। ভালুক কেন গাছে উঠেছিল জানি না, বোধ হয় সেই গাছে মৌচাক ছিল। লোকটা হাতের কুড়াল নিয়ে ভালুকের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয়নি। ভালুকটা ওকে জমিতে শুইয়ে ফেলে ওর বুকে নাকি চড়ে বসে। ওর মুখ ও নাক এক থাবার আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়।

স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে লোকটা সেরে গিয়েছিল বলেই শুনেছিলাম।

আর একটা মজার গল্প শুনি হুব্‌লাবেড়া ফরেষ্টে।

গত ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে আমি হুব্‌লাবেড়া পাহাড় ও বনাঞ্চলে কয়েকদিন যাপন করি মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। বনাঞ্চল ভালবাসি বলেই ভগবান নানা সুযোগ ও সুবিধে আমায় ঘটিয়ে দিয়েছেন অতি অদ্ভুত সব beauty spot দেখবার ও বেড়াবার। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে

আমার বনভ্রমণের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই মনে করি। কিন্তু এ ভ্রমণ কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে এখন বলচিনে, শুধু ভালুকের গল্পটি আমার কাছে বড় মজাদার মনে হয়েছিল বলেই এখানে উল্লেখ করি।

দুব্লাবেড়া অরণ্যের মাঝখানে একটা উপত্যকা, দুদিকে দুই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে। এই পাহাড় শ্রেণীর ওপর বেশ জঙ্গল তবে তত ঘন নয়। বেশিরভাগ শাল ও কেঁদগাছের বন, তবে একটা পাহাড়ে অজস্র বন্যশেফালি-বৃক্ষ। শুধুই শেফালি নয়, শেফালির জঙ্গলও বলা যেতে পারে। এর নাম চরাই পাহাড়, আর ওপরের পাহাড়ের নাম আটকুশি রেন্‌জ। আটক্রোশ দীর্ঘ বলেই বোধ হয় এর এরকম নাম, তবে আমি সঠিক জানিনে ওটা আটক্রোশ লম্বা কিনা।

এই উপত্যকায় ছিল আমাদের তাঁবু, চরাই পাহাড়ের ঠিক নীচের ঢালুতে।

রাত্রিকালে একদিন এখানে একজন লোক এল। সে এসে ওখানকার ভাষায় বল্লে—বড্ড বিপদে পড়েছিলাম ওই পাহাড়ের নীচেটাতে।

লোকটি হাঁপাচ্চে। আমরা বলি—কি হয়েছিল ?

—বাবু, ভালুকে পথ আটকেছিল।

—কি রকম ?

সে আসছিল উপত্যকার মুখে যে বন্যগ্রাম আছে সেখানে থেকে। সন্ধ্যা তখনও ভাল রকম হয়নি। জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা ভালুক মহুয়াফুল খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তার ওপর মাতলামি করতে দেখতে পায়। আর কিছুতেই সে নড়তে পারে না। এদিকে ওদিকে কোনোদিকেই যাবার উপায় নেই। মাতাল হয়ে ভালুকে পথ আটকেচে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে বাবু!

আমরা বল্লাম—কি রকম মাতলামি করছিল ?

—ঠিক যেমন মানুষে করে। হেলছিল, দুলছিল, টলছিল।

—আপন মনে ?

—একদম আপন মনে—তারপর ?

—তারপর আর কি। সেখানে দু'ঘণ্টা বসে। রাত হয়ে গেল। তারপর ভালুকদের কি খেয়াল গেল পথ ছেড়ে টলতে টলতে বনের মধ্যে ঢুকলো। তাই এই আসচি।

—মাতাল ভালুকে কিছু অনিষ্ট করে ?

—বাবু, ও জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। বাঘকে বিশ্বাস করা যায় তবু ও জানোয়ারকে না। ওর মাতলামি দেখলে না হেসে থাকা যায় না বটে, কিন্তু বাবু, সাহস করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। যদি ঘুরে দাঁড়ায়।

সে কথা ঠিক।

এই গেল সিংভূম অরণ্যের ভালুকের কথা। ওদিকে এমন অনেক লোক দেখেছি, যার হয়ত নাক নেই, কি একখানা হাত নেই। ভালুকের হাতে সেগুলো খোয়াতে হয়েছে। পাকা কুল ও মহুয়া ফুলের সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মার্চ্চ মাসের দিকে বনের পথে একা না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাবধানের বিনাশ নেই।

সিংভূমের বাঘ সম্বন্ধে আরও দু একটি গল্প এখানে করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সিংভূমের বনে লেপার্ড জাতীয় বাঘ এবং রয়েল বেঙ্গল জাতীয় উভয় প্রকারের বাঘই আছে। উভয় জাতীয় বাঘই ভীষণ হিংস্র। রয়েল বেঙ্গল বরং ভাল, লেপার্ড জাতীয় বাঘ বেশী শয়তান। গত বৎসরে আমি সংবাদ পাই স্থানীয় থানায় একটা বাঘ ও একটা মানুষের মৃতদেহ আনা হয়েছে, পরস্পর পরস্পরকে মেরেছে। ব্যাপার শোনা

গেল বাদাডেরা নামে একটি বন্য গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বর্শা পুঁতে মারবার ফাঁদ তৈরি করে। একটা বড় বাঘ ঐ অঞ্চলে উপদ্রব করছিল। সন্ধ্যার দিকে বাঘটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে। বাঘের অবস্থা দেখতে যেমন গিয়েছে, অমনি বৃদ্ধ শিকারী পড়ে গেল বাঘের হাতে। দুইজনে জড়াজড়ি করে ঘোর যুদ্ধ। বাঘ প্রচণ্ড থাবার ঘায়ে লোকটাকে ভীষণ জখম করলো, লোকটাও বর্শার ঘায়ে বাঘটাকে ততোধিক জখম করলো। তারপর লোকজন ছুটে এসে পড়ে, তখন বাঘটা মরে গিয়েছে কিন্তু মানুষটা বেঁচে আছে।

ঘাটশিলার হাসপাতালে আনবার পথে বৃদ্ধও মারা গেল।

একবার আমরা এক অদ্ভুত কথা শুনি।

সৌরীনবাবু বলে আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক বল্লেন—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচেন? সেখানে আমরা পূর্ণিমার রাত্রে গিয়ে দেখেছি ময়ূরেরা এসে নাচে!

—কি রকম?

—একটা পরিষ্কার জায়গা আছে বনের মধ্যে। সেখানেই এসে ওরা গভীর রাত্রে নাচে। পূর্ণিমার রাত্রে কিন্তু। অন্য রাতের কথা আমি বলিনি!

—ময়ূরেরা যে এমন কবি, তা জানা ছিল না। দেখাবেন আপনি?

—খুব! চলুন না।

সোরু ঝর্ণা কোথায় কতদূরে সে সন্ধান দিতে পারলেন না সৌরীনবাবু। তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর কোন ধারণাই নেই। তবে সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বনের মধ্যে এটা তিনি ঠিক জানেন। সে বড় দুর্গম জায়গা।

আমরা এক রবিবারে সুবর্ণরেখার ওপারে পিক্‌নিক্ করতে

গেলাম। আমার ভাই নুটু, তার বন্ধু সুরেশ, আরও দু'তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপটুপ গাছের তলায় পড়চে, লতাপলাশের ফুল ফুটেচে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেচে পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কতদূর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় সুমিষ্ট ফল। আমরা উঠিয়ে দিলাম একটা লোককে গাছে। সে উঠে গাছ ঝাড়া দিয়ে অনেক কেঁদফল পাড়লে। স্থানীয় হাটে পাকা কেঁদফল শালপাতার ঠোঙায় বিক্রি হয়। আট দশটা ফল এক পয়সায়।

পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা বনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেচি কতদূর। চৈত্রের রোদ চড়চে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়চে গাছতলায়। ঝাটিফুলের মৃদু সুগন্ধ বাতাসে। একস্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেচে। ঝর্ণার দুপাশে বন্য জামবৃক্ষের সারি। ছায়া পড়েচে জলে।

আমরা এই জায়গাটা পিক্‌নিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গরুর গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামানো হোল। সবাই বল্লে, এখানে ছায়া আছে। এখানেই রান্নাবান্না হোক। সবাই মিলে লেগে গেলো কাজে।

আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথ-রেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম। দেখি না, ওদিকে কি আছে।

আপন মনে পথ চলেচি, বড় রোদ, পাথর তেতে উঠেচে রোদে, মহুয়া ফুল কুড়িয়ে খেতে খেতে চলেচি। পাহাড়শ্রেণী চলেচে এই ক্ষুদ্র পথটির সমান্তরাল ভাবে বামে ও দক্ষিণে।

অনেক দূরে এসে একটা গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা নয়, একটা বড় কুসুম গাছের তলায় ঘর পাঁচ ছয় লোক

বাস করচে। গ্রামের একটা লোক গাছের তলার ছায়ায় বসে পাহাড়ি চীহড়লতার ঝুড়ি বুনচে। আর শালপাতার শিকা'র ধূমপান করচে। শিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতা জড়ানো খানিকটা তামাকপাতা। এক রকম বিড়ি বলা যেতে পারে। কাছে একটা মস্ত কুকুর। কুকুরটাকে দেখে মনে হোল, সেটা বাঘকেও ভয় করে না। করবার কথাও নয়।

বল্লাম—এটা কি গাঁ রে?

—বালজুড়ে।

—ক' ঘর আছিস্ রে?

সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই যে ক' ঘর দেখচিস্ রে।

—তোর নাম কি?

—চুক্‌লু।

—কি করচিস্?

—দেখতে তো পাচ্চিস্। মুড়ি সাঁট্‌চি।

—এখানে তো চারিদিকে বন, থাকিস্ কি করে?

—হোই। বেশ থাকি।

—হাতী আছে রে?

—হাতী আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে।

বলেই চুক্‌লু আমার চোখের সামনে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে। অতিথি সৎকারের জন্যে একটা কাঁচা শালপাতার শিকা জড়িয়ে সে দু'খানা কাঠ ঘষে আমার সামনে আগুন জ্বালাল। বল্লে—ধরাও—

আমি অবাক্।

এই যুদ্ধের বাজারে দেশলাই কবে পাওয়া যায় না যায়। এ কৌশলটি শিখে রাখলে মন্দ কি? আমি কৌশল শিখতে চাইলাম। চুক্‌লু হেসে সামনের পড়াশি গাছের ডাল একটা ভেঙে এনে তার মধ্যে

দা দিয়ে ছোট্ট একটা বিঁধ করলে। আর একটা সরু ডালের এক দিক ছুঁচলো মত করে, সেই বিঁধে বসিয়ে দুহাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলো। বিঁধওয়ালা কাঠখানার তলায় রাখলে কয়েকটি শুকনো শালপাতা। দেখতে দেখতে শুকনো পাতা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। চুক্‌লু ফুঁ পাড়তেই দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বিড়ি ধরিয়ে নিলাম।

আমি ওখানে বসে পড়লুম। আমার উদ্দেশ্য হচ্চে সোরু ঝর্ণার সন্ধান নেওয়া। জায়গাটিও চমৎকার লাগচে। চৈত্র দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে চারিদিকে। দুদিকে পাহাড় শ্রেণী, মধ্যে এই সংকীর্ণ বনাবৃত উপত্যকা। প্রথম বসন্তে পাহাড়ের বনে কোকিল ডাকচে। মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ গরম বাতাসে। চুক্‌লুর দুখানা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালা। কাঁচা শালপাতার শিকা জড়িয়ে খাওয়া। মুক্ত জীবনের ছন্দে মুখর দুর্লভ মধ্যাহ্নটি।

ওকে বলি—চুক্‌লু, ময়ূর দেখেচ বনে?

—মজুর? আছে, অনেক আছে। মজুর কত নিবি?

—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচিস্?

—হ্যাঁ, ক্যানে শুনবেক না।

—ওখানে ময়ূর আছে?

—মজুর সব বনেই আছে। এই সব পাহাড়েও আছে। এখানে বোস, সাঁঝের সময় কত মজুর দেখবি। কিন্তু পূর্ণিমার সোরু ঝর্ণার শিখী নৃত্য? সেটা উপকথা না কিংবদন্তী। তার মূলে কিছু আছে কিনা, সে সন্ধান এখানেই আমার আজ নিতে হবে। সে সন্ধানেই বেরিয়েছি আজ।